প্রেম

বাণী রায়

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রথম, পরিবর্ধিত প্রকাশ
ঝুলন যাত্রা ১৩৬২

প্রকাশক
জ্যোতিপ্রসাদ বসু
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯ হ্যারিসন রোড কলিকাতা-৭

মুদ্রক
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫এ, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
দি নিউ প্রাইমা প্রেস
এস. সি. রায়

ব্লক
টাওয়ার হাফটোন কোং (১৯৫৪)

বাঁধাই
এশিয়াটিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম চার টাকা

পৃথিবীর কোথাও যদি সে মেয়ে থেকে থাকে,

যে পুরুষের হাতে ক্রীড়নক হয়নি—

তারই উদ্দেশে দিলাম।

রূপালী ব'সে আছে আলোর নীচে।

গোল গামলার মত আলোর বাল্‌ব থেকে যে স্তিমিত দ্যুতি নির্গত হচ্ছে, তাতে ঘরের অন্ধকার ঘোচে সামান্য পরিমাণে, তাই লেখাপড়ার কাজের জন্য টেবিলে রাখা আলো তার জ্বালাতে হ'ল পরিবর্তে।

পুরু নীলাভ কাগজের খসখসে লুজ-লীভ খাতার ওপরে হাত দিয়ে সে চুপ ক'রে ব'সে আছে। মহাভারতের মত প্রকাণ্ড সেই খাতা—তার জীবনের ইতিহাস, বুদ্ধির দীপ্তিতে স্পষ্ট ক'রে তোলা।

রূপালীর চেহারা বর্ণনার দরকার। বয়স তার চল্লিশ, কিন্তু আমি তাকে পাঠকের সামনে দেখাতে চাই তরুণীরূপে। তাই তার পনরো বছর আগেকার সৌন্দর্য্যই আমি দেখব। রূপালীর বয়স হয়েছে বলতে আমার বাজছে। পঁচিশ বছরের রূপালীকেই আমি চিনতাম শেষ পর্য্যন্ত। তাই আজও তার ছবিই মনে জাগছে আমার।

আর যে কথা—তার জীবনের যে পরিণতির কথা বলতে চাই, সে তো শেষ হয়ে গেছে। আজ তার পরিণতি পূর্ণ। সুতরাং ভবিষ্যৎ-বর্ণনার কোন প্রয়োজন নেই। অতীতে চল।

কালো, নিকষ-কালো রেশমের মত চুল, অত্যন্ত মসৃণ

বেণীতে বন্দী হয়ে হাঁটুর নীচে পড়েছে। সুদীর্ঘ সে অলকগুচ্ছ, সিল্কের মত নরম, কিন্তু পাতলা। আরও একটা দোষ আছে সে চুলের, একেবারে সোজা। কোথাও একটু কুঞ্চনরেখা অথবা তরঙ্গ নেই। সাধারণত সোজা সিঁথি করে সে। ছোট ঢালু কপালের দুইপাশ দিয়ে সোজা চুল তার শুক্তিশুভ্র কানের ওপরে নেমে আসে।

রূপালীর মুখে সকলের আগে চোখ পড়ে তার স্বচ্ছ চোখ। সমস্ত কিছুকে যেন মোহ থেকে ভিন্ন ক'রে দেখছে, এমনই একটা ভাব আর কি! তারপরে দেখা যায় তার নাক। মেয়েদের পক্ষে বেশী উন্নত। ভ্রূরেখা তার ধনুকের মত, কিন্তু ঘন নয়, একটু বেশী পাতলা। চিবুক পাথরে-কাটা মূর্ত্তির মত। অধরোষ্ঠ দুটি সরলরেখা।

আশ্চর্য্য কিন্তু তনুদেহ রূপালীর। মনে হয়, গ্রীক শিল্পী সযতনে নির্ম্মাণ করেছেন ব'সে। বেশীর ভাগ সূক্ষ্ম চীনাংশুক পরত সে, লঘু দেহের প্রতিটি বক্ররেখা পর্য্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত।

আমার মুগ্ধ দৃষ্টি বহুদিন রূপালীকে অনুসরণ করেছে। আমার মনে, আমার ধারণায় সে ধরা দিয়েছে বহুদিন। কিন্তু আমি কি তাকে ভালবেসেছিলাম? সে প্রশ্নের উত্তর এখন নাই বা দিলাম। এ আখ্যায়িকা প'ড়ে তোমার যা মনে হয় ভেবে নিও।

রূপালীর কাহিনী আমি বলব নিরপেক্ষভাবে, যেন আমার এতে কোন অংশ নেই—যেমন নিরপেক্ষ, উদাসীনভাবে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দাঁড়িয়ে জলকল্লোল শোনে, জলের লীলা দেখে, তেমনই ভাবে। শুধু সৌন্দর্য্যের প্রশংসা ভিন্ন কোন ভাব মনে জাগে না তার।

রূপালীর মধ্যে যদি কিছু অসাধারণ থাকে, তবে সে হচ্ছে তার মন। অপূর্ব্ব কৌতূহলী সে, সর্ব্বদা নূতনত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছে; সহজ শাণিত দৃষ্টিতে জগতের দিকে চেয়ে দেখছে। দ্রুত তার হচ্ছে প্রতিক্রিয়া। সাধারণ ভাবপ্রবণতা তাকে স্পর্শ করে না।

এখন যে রূপালী আলোর নীচে ব'সে আছে, সে হচ্ছে প্রবীণা, তার কথা আমি বিশেষ জানি না। একটা যবনিকা সরিয়ে বহুদিন পূর্ব্বের রূপালীর কথাই বলছি আমি।

রূপালী সাধারণ মেয়ে নয়। তাই আমার তাকে ভাল লাগে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার, কিন্তু ধূর্ত্ত সে নয়। পনরো বছর বয়স পর্য্যন্ত সে ছিল, যাকে চলতি বাংলায় বলে, 'কুনো'। তারপর দ্রুতগতিতে তার উত্থান হ'ল।

রূপালী সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে, রাজা-জমিদার ছিলেন তার পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু ধীরে ধীরে ঐশ্বর্য্য চলে গেল, ফেলে গেল পিছনে কেবল একটা অপরূপ সুন্দর অতীতের গৌরব। রূপালীর বাবা বংশের মেজ ছেলে, স্ত্রীকে নিয়ে এলেন কলকাতায় অর্থোপার্জ্জন করবার জন্য। সাধারণ চল্লিশ টাকা ভাড়ার একটা বাড়িতে রইলেন তাঁরা অনেক দিন।

রূপালীর তরুণ মন তখন সবেমাত্র বিকশিত হচ্ছে—একটির পর একটি পাপড়ি উন্মীলিত ক'রে। তখন চাই তার সূর্য্যের আলো, চাই তার প্রশান্ত সমীরণ।

এখন যে রূপালী নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে আছে, আমি জোর ক'রে বলতে পারি, তার মনে জাগছে সেই বাড়িটি।

সম্মুখে একতলার ওপরে ছাদ একটা, খোলা ছাদ—মাথার ওপরে দেখা যেত মুক্ত নীলাকাশ। এক পাশে স্তূপ-করা

মাটি-পাথরের অন্তরালে উঠেছিল ফুলের গাছ। লাল লাল ফুল সব, কিশোরীর তাম্বুলরক্ত অধরের মত। এক কোণে জলের ট্যাঙ্ক, শৈবালাচ্ছাদিত ভূমির ওপর দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়ত। সবসুদ্ধ জায়গাটায় যেন একটা প্রকৃতির অবারিত স্পর্শ মাখানো ছিল। যে সৌন্দর্য্য বিশাল বিটপীশ্রেণীতে, ফুলের বনে, ঝরনার জলে ছড়িয়ে থাকত, সে সৌন্দর্য্য দেখা দিয়েছিল রূপালীর সেই ফালির মত ছোট ছাদে। রূপালীর প্রকৃতি ছিল সেইখানে। তাই ছাদের বর্ণনা না দিলে রূপালীর জীবন-নাট্য অসম্পূর্ণ থাকে।

জীবনে নাটক রচনা করি নি, উপন্যাস লিখতে পারি নি, কিন্তু আমার এ প্রয়াস কেন? রূপালীর মনের খবর আমি ভিন্ন কে জানে? কার একাগ্র দৃষ্টির সম্মুখে তার মন দল খুলে বিকশিত হ'ল? যদি আমার লেখায় ত্রুটি থাকে, ক্ষমা ক'রো; যেখানে পারব না সেখানে রূপালীর খাতা থেকে তুলে দেব।

প্রথমেই বলেছি, রূপালী সাধারণ মেয়ে নয়। সাধারণ মাপকাঠিতে তাকে মাপতে যেও না, ঠ'কে যাবে। নির্জ্জনতার মধ্যে সে মানুষ হয়েছিল। তার মায়ের সংসারের কাজ সারা ক'রে প্রচুর সময় ছিল না মেয়েকে সঙ্গ দেবার। আশেপাশের বাড়িগুলো অধিকার ক'রে যারা থাকত, হয় তারা খুব বড়লোক, নয় খুব ছোটলোক। তাই তাদের সঙ্গে রূপালীর মেশা হ'ত না। অজস্র বই ছিল তাদের বাড়িতে—নাটক, গল্প, উপন্যাস। সে-সবের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ক'রে ক'রে, একলা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকে থেকে রূপালীর মন যে ভাবে গ'ড়ে উঠেছিল, তার ছাঁচ আলাদা। নিজেকে বোধ হয় বুঝতে শিখেছিল সে।

রূপালীর রং ছিল রক্তহীন ফরসা, তাই নাম হ'ল তার রূপালী। দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল; সমস্ত মুখের মধ্যে দুজোড়া

কালো কালো চোখ ভিন্ন কিছু ছিল না তার দশ বছর বয়সে। মনে হ'ত, একে ধমক দিলেই বা এর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলেই এ গ'লে যাবে, বরফে গড়া মূর্ত্তি যেমন আগুনের আঁচে গ'লে যায়। সে যেন ছিল নিষ্পাপ শৈশবের প্রতিমূর্ত্তি, যেন দয়া ক'রে ধূলার ধরণীতে নেমে এসেছে।

রূপালীর জীবনে প্রেম এল অতি অল্প বয়সে, যে বয়সে তার উচিত ছিল বই খাতা নিয়ে শিক্ষায়তনে সারাদিন অতিবাহিত করা। কিন্তু দুর্ব্বল শরীর ব'লে একটু দেরী ক'রে সে স্কুলে গিয়েছিল। বাড়িতে তার কোন সাথী ছিল না, কোন বিষয়ে মন দেওয়া সম্ভব হ'ত না কেবল সাহিত্য ভিন্ন। তাই ভালবাসার একটা অস্পষ্ট রূপ আকার ধ'রে উঠেছিল তার মনে। ভালবাসত সে উন্মাদের মত, অতি পবিত্র সে ভালবাসা। কোন দৈহিক অর্থ ছিল না তার। যে মেয়ের মন শাণিত ছুরির মত, সে কি প্রেমকে শুধু 'প্রেম' বলে নিতে পারে না ?

রূপালীর মন ছিল 'প্যাশনেট', যার যথার্থ অর্থ বলা বিপদ। একদিকে নিজেকে ঢেলে দেওয়াই যে মনের ব্যবসায়, তাকেই 'প্যাশনেট' বলতে পারা যায়। যে মন তার সমস্ত জাগ্রত বুদ্ধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা একটা বিশেষ স্থানে স্থাপন ক'রে নিজেকে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে চায়, সেই মনকে বলব প্যাশনেট্ ; সে বিশেষ বস্তু মানুষই হোক, ছবিই হোক বা কবিতাই হোক। প্রেমকে আশ্রয় করেছিল রূপালীর মন। একটা কিছু দ্রব্য তার দরকার ছিল, যাকে সে ভালবাসবে ; কিন্তু মনে রেখো, সে ভালবাসা শিশুর মত শুধু অবলম্বনের ভালবাসা নয়, সে ভালবাসা এক সদ্যজাগ্রত কিশোর-মনের প্রেমের ইচ্ছা। সে চায় প্রেমাস্পদ।

রূপালীকে তোমরা এঁচোড়ে-পাকা ভাবপ্রবণ ব'লো না এক

নিঃশ্বাসে। তাকে বুঝতে চেষ্টা ক'রো—এই আমার অনুরোধ। তার জীবন ছিল যেন প্রেমের জন্য। সূতিকাগারে তার নির্ম্মল ললাটে যেন রেখা পড়েছিল—সারা জীবন তোমাকে প্রেম নিয়ে থাকতে হ'বে।

তার ওপর রূপালীর মন ছিল শিল্পীর মন। কবিতা লিখতে, ছবি আঁকতে বা ভাল গান গাইতে তখনও পারত না সে, তবু ভাবাকুল শিল্পীর মত সুকুমার ছিল তার মন। প্রতিটি বস্তুর সুন্দর রূপটিই পড়ত তার চোখে। শিল্পীর মনের বৈশিষ্ট্য ছিল তার মনে—সে বৈশিষ্ট্য ভালবাসা।

রূপালীর জীবনে প্রেম এসেছিল অতি অল্প বয়সে, যখন সে বাড়িতে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজের মায়ের কাছে থাকত। প্রথম সে ভালবাসল তার পিসেমশায়কে। কেন যে তাঁর কাছে থাকতে, তাঁর কথা শুনতে, তাঁকে দেখতে ভাল লাগত, সে তা জানত না। কিন্তু অনুভব করত একটা নিগূঢ় বন্ধন। অবশ্য সে ভালবাসা—শিশুর ভালবাসা, প্রথম উজ্জ্বল জিনিসটির প্রতি।

তার পিসেমশায় ছিলেন সুন্দর, তার বাবা, কাকা, মামার চেয়ে। মনোমোহকর ছিল তাঁর ব্যবহার, সরস কথাবার্ত্তা, তাই তাঁকে ভাল লাগত রূপালীর। নারীর মনই এই, সে চায় ভালবাসতে। ভালবাসার মধ্যেই তার পূর্ণ পরিণতি।

সে চায় আশ্রয়প্রার্থিনী লতার নির্ভরতায় সহকারকে আলিঙ্গন করতে। যুগে যুগে, কালে কালে এই-ই রমণীর মন। যখন থেকে রমণীর মন জাগ্রত হয়ে ওঠে, তখনই সে চায় ভালবাসার বস্তু। এই জাগরণ সকলের এক সময়ে হয় না, কারও বা আগে, কারও বা পরে। কিন্তু এই জাগরণ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মন খুঁজে বেড়ায় ভালবাসার পাত্রকে। তখন তার ভাল-মন্দের বিচার থাকে না। সদ্যজাগ্রত মনের ক্ষুধা

মেটাবার জন্যেই ব্যস্ত, তার ভালবাসার বস্তুর যোগ্যতা-অযোগ্যতা ভেবে দেখবার সময় থাকে না। তাই অনেক সময় যোগ্যের সঙ্গে অযোগ্যের যোগাযোগ হয়। আর অনেক মেয়ে মনের স্বাভাবিক অবস্থার স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। তাদের মানসিক শক্তি রূপালীর মত মেয়েদের চেয়ে অনেক কম, তাই হয় তাদের পতন।

রূপালী চেয়েছিল ভালবাসা ; কিন্তু জানে না সে, ভালবাসা কাকে বলে। শিশুচিত্ত তার সূক্ষ্ম কলাপ্রিয়তায় পরিণতি লাভ করেছিল, কিন্তু যেসব বিষয়ে সাধারণ মেয়েরা জানে বেশী, সে তা শেখেনি বিশেষ।

আজ রূপালী এই যে ব'সে ব'সে তার প্রকাণ্ড লূজ-লীভ খাতার পাতা উল্টে যাচ্ছে, সে আজ শিখেছে ভালবাসা কাকে বলে। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অশ্রু দিয়ে রূপালী বুঝেছে ভালবাসা নিয়ে যতই না কেন পরীক্ষা করা যায় বর্ত্তমান যুগে, ভালবাসা লাভের বা ভালবাসার ভাগ্য খুব কম মেয়েরই জোটে। অনেকে ভাবে, তারা ভালবাসছে ; কিন্তু তখনও ভালবাসা তাদের মনে আসে নি। অথবা তারা যাকে ভালবাসছে ভেবে ভালবাসে, তাকে শেষে দেখা যায় তারা ভালবাসে নি। একটা সামান্য মোহকে তারা ভালবাসার পর্য্যায়ে ফেলেছে। হয়তো বিবাহের পর লোকে আবিষ্কার ক'রে থাকে, তারা বিবাহ করেছে যাকে, সে তাদের প্রেমের পাত্র নয়। বিবাহের পর প্রেম-পাত্রের দেখা পাওয়া মানুষের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাদ, ইংরেজী অভিধানে যাকে 'ক্রাইসিস' বলে। রূপালীর খাতায় এই মর্ম্মের একটা কবিতা আছে। সেইটা তুলে দিলে আমার কথা ভাল ক'রে বলা হয়। কোথা থেকে রূপালী

এসব কবিতা যোগাড় করে জানি না। আমার তো আর ইংরেজী সাহিত্য রূপালীর মত ক'রে পড়া নেই।—

"Each on his own strict line we move
And some find death ere they find love ;
So far apart their lives are thrown
From the twin soul which halves their own.
And sometimes, by still harder fate,
The lovers meet, but meet too late.
—Thy heart is mine !—True, true ! ah. true !
—Then, love, thy hand !—Ah no ! adieu !"

কিংবা তারা যাকে ভালবাসে, তাকে পথের ধারেই ফেলে আসে, না চিনতে পেরে। একদিন সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে তারা, অনুভব করে, তাদের জীবনেও প্রেম এসেছিল, কিন্তু তাকে তারা 'মোহ' ব'লে ভুল ক'রে অবহেলা করেছে। এ যেন ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজা !—

"চেয়ে দেখিত না নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশপাথর।

*   *   *

অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার একপল ভর—
ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর।"

প্রেম চিনতে পারা, প্রেম পাওয়া এতই কঠিন ! রূপালী সারাজীবন প্রেমের জন্য সাধনা করেছিল, কিন্তু শেষে সেও আবিষ্কার করলে যে, সারাজীবন ধ'রে দিয়েছে অনেক, কিন্তু বিনিময়ে বিশেষ কিছু পায় নি।

রূপালীর ডাইরি (বারো বছর বয়সে)—

'স্কুল থেকে ফিরে এসেছি। আমাদের ছাদের অজানা ফুল-গাছগুলি পুষ্পসমাকুল হয়ে উঠেছে। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোতে ব'সে মনে হয়, আমি যেন এক রূপকথার দেশে চ'লে গিয়েছি। হয়তো এই ধূসর যবনিকার অন্তরালে এক মায়াপুরী আছে। সেই মায়াপুরীর প্রবাল-খচিত মণি-পর্য্যঙ্কে আমার রাজকুমারী চিরসুপ্তা। সোনার কাঠি কোথায়? কে তার ঘুম ভাঙাবে?'

* * *

'আজ স্কুলে একজন নূতন টীচার এসেছেন। তিনি বড় সুন্দর! আমি তার ক্লাসে তাঁর দিকে শুধু চেয়েছিলাম, কোনও পড়া শুনি নি। তাঁর নাম মণিকা। তিনি এবার এম. এ. পাস করেছেন। এত অল্প বয়সে, এত ভাল ক'রে পাস-করা কোনও টীচার আর আমাদের নেই সুতরাং তাঁকে ভালবাসব না কেন?'

দু'টো পাতা উল্টে দেখা যাক—

'মণিকাদি আজ আমার খাতা দেখে 'গুড' দিয়েছেন। ওঁর হাতের লেখাও কি এত সুন্দর! জি-এর টানটি কি চমৎকার!'

আবার কিছু পরেই রয়েছে—

'আজ মণিকাদি আমার হাত ধরেছিলেন। কেন মনে নেই, কিন্তু তাঁর সে স্পর্শ মনে আছে।'

তার কিছু পরেই রবীন্দ্রনাথের দু'টো পংক্তি তোলা—

"একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি,
তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।"

একে কি বলা যায়? ইস্কুলে-পড়া মেয়ের অহেতুক ন্যাকামি? কিংবা অর্দ্ধবিকশিত নারী-মনের অস্বাস্থ্যকর ভালবাসার পূর্ণতার ইচ্ছা?

হয়তো আমি এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে পারব না, তবু কেবল এইটুকু বলতে চাই যে, তখনকার রূপালীর মনের এই ভাবধারার মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র খাদ ছিল না। দেহজ প্রেমের একটা অস্পষ্ট রূপই তার ধারণায় ছিল, কথাটার অর্থ তার ভাবাকুল মনের মধ্যে প্রবেশ করে নি। হয়তো তুমি বলতে পার, বারো বছরের মেয়ের পক্ষে দেহজ প্রেমের ধারণা করা অস্বাভাবিক। কিন্তু সত্যই কি তাই ? আমাদের দেশে বারো-তেরো বছরে মেয়েরা অনেক শেখে। আর আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই অল্প বয়স থেকে হয় নারী-মনের পূর্ণতা। প্রেম এমন একটা জিনিস, সেটা কোন মেয়ের শিখতে হয় না। দেহজ প্রেমের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও একটা অনুভূতি অজ্ঞাতসারে মনে এসে যায়, যাকে বলা হয় 'ইন্‌ষ্টিংক্ট'। তবে পরিষ্কার ধারণা থাকে কারও কারও, কারুর বা সে ধারণা হ'বার সুযোগ বা সুবিধা থাকে না। রূপালীর ক্ষেত্রেও শেষোক্ত ক্রিয়া হয়েছিল। সে থাকত নির্জ্জন মাতাপিতার স্নেহচ্ছায়ায় ! কোনও নবদম্পতির মিলন বা সমবয়সী মেয়েদের বিবাহ দেখে নি। উপন্যাস সে যা পড়েছিল, সব আদর্শপন্থী—দেহজ প্রেমের উল্লেখমাত্র ছিল না তাতে। এ বিষয়ে তার মা-বাবা খুব সতর্ক ছিলেন। মেয়ের অস্বাভাবিক বই পড়ার স্পৃহা জেনে তাঁরা বাড়িতে কোনও বিকৃতরুচি পুস্তকের আমদানি করেন নি। কাজেই চোদ্দ বছর পর্য্যন্ত রূপালীর জগৎ রইল প্রেমের কাকলীমুখরিত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতিতে পূর্ণ। মানসিক প্রেম সে বুঝেছিল, কিন্তু দেহজ প্রেমের বিশেষ কিছুই বোঝে নি। তবু সমাজে বা গৃহাশ্রমে থাকতে হ'লে যেটুকু আভাস এড়ানো যায় না, সেটুকু তার এসেছিল, অনাহূতভাবে ; কিন্তু তার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

অথচ অনেক বাংলা উপন্যাসের নায়িকাদের মত কলেজী-শিক্ষা পেয়ে এবং যৌবনোদ্গম সত্ত্বেও অহেতুক ন্যাকামি তার ছিল না। সাহিত্যে ও-রকম অস্বাভাবিক চরিত্র-সৃজন বৃথা।

এই দেহজ প্রেমের অনুপস্থিতি রূপালীকে—নারীকে প্রেমাস্পদরূপে দেখতে সক্ষম করিয়েছিল, সাধারণ মেয়েদের মত অন্য কারণে নয়। যে প্রেমের জন্ম হৃদয়ের এক উদ্বেল ভাবধারা থেকে, সৌন্দর্য্য অনুশীলনে যার সার্থকতা, সে প্রেম প্রেমাস্পদের কাছ থেকে কি চায়? কেবল ভাবেরই আদান-প্রদান। সুতরাং নারী বা পুরুষে তার কাছে প্রভেদ কোথায়? তাই এক পরিপূর্ণ নারী-মনের সমস্ত আকুলতা এক নারীকেই আশ্রয় ক'রে জেগে উঠল যোগ্য পুরুষের অভাবে।

রূপালী-জীবনে এই নারীপ্রেমের ছু'-চারটে উদাহরণ দিতে পারি আমি, কারণ তার ওই বয়স থেকেই অদম্য প্রেমস্পৃহা দেখা দিয়েছিল।

বসন্তের আকুল সন্ধ্যা, সুমধুর আবেশে পূর্ণ। কলকাতার ইট-কাঠের বন্ধনের অবকাশে উতলা দক্ষিণ-সমীরণ দোলা দিয়ে যাচ্ছে তাদের ওপরের 'রুমাল-উদ্যানে', ছু-একটা সেই নামহীন লাল ফুল ঝ'রে পড়ছে বৃন্ত থেকে মুক্তি পেয়ে।

রূপালী ছাদে বেড়াচ্ছিল ঈষৎ দ্বিধার ভাবে। ছাদ থেকে তাদের শোবার ঘর দেখা যায়। সেখানে জানালার পাশের চেয়ারে যে একজন ভদ্রমহিলা ব'সে আছেন, তিনিই এতক্ষণ রূপালীর মনোহরণ করছেন বোঝা যাচ্ছে। তাঁকে বর্ণনা করব কি? করা তো খুবই উচিত! নায়িকার প্রেমের উপাখ্যানে যাঁদের ভূমিকা আছে, তাঁদের দর্শকের সামনে ধ'রে তোলা গতানুগতিক পন্থা।

ভদ্রমহিলার বয়স প্রায় ত্রিশ। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম অর্থাৎ বাঙালীর ঘরের গৌর। মুখ চোখ সাধারণ। অত্যুগ্র বেশভূষা দর্শনীয়।

রূপালী ইতস্তত ভাবে বিচরণ করছে আর মাঝে মাঝে কার্নিসের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

মাধুরীদি তোকে ডাকছেন রূলি, এদিকে আয়।—হঠাৎ রূপালীর মা উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে ইশারা করলেন ঘর থেকে।

এক মুহূর্তে রূপালীর রাগ হয়ে গেল। কি বিসদৃশ ব্যবহার তার মায়ের! কি অভদ্র, কি ভাল্‌গার। মাধুরীদির সামনে তিনি অত জোরে চেঁচিয়ে কথা বলেন কেন? যদি ডাকবার ইচ্ছা হয়, নিজে বেরিয়ে এসে ডাকতে পারেন না? ছি ছি, মাধুরীদি কি ভাববেন!

মাধুরীদি স্থানীয় মেয়ে-স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, এম. এ., বি. টী. পাস। তাঁর ডিগ্রীর মহিমায় ও প্রসাধনের ঔজ্জ্বল্যে রূপালী মুগ্ধা! রূপালীর বাবা পরিচালক-সঙ্ঘের অন্যতম, সেই সূত্রে রূপালীর বাড়ীতে মাধুরীদির আসা।

রূপালীর রক্তহীন মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বক্ষের চাঞ্চল্য দ্রুত হয়েছে। সে এ আহ্বান আর উপেক্ষা করবে না, যাবে মাধুরীদির সামনে। নিজের কথাবার্তায় জানিয়ে দেবে সে ফোর্থ ক্লাস থেকে প্রথম হয়ে থার্ড ক্লাসে উঠেছে। এবারে যে বইগুলো প্রাইজ পেয়েছিল—আঃ, সেগুলো যে মা আবার মাসীমাকে পড়তে দিয়েছেন! নইলে মাধুরীদিকে দেখিয়ে দেওয়া যেত, সে একটি নামজাদা ভাল মেয়ে। মাধুরীদি মেয়েদের পড়ান, লেখা-পড়া নিশ্চয় ভালবাসেন। সারা জগৎটাই যেন মা-মাসীর উৎপাতে তটস্থ হয়ে আছে!

রূপালী নিজের কাপড়খানা একটু ঠিক ক'রে নিল। তার কাকার ঘরের আয়নায় একবার নিজের মুখ দেখে নিল। তারপর ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে আলমারির কোণটা চেপে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল। এই তার অপরিচিতের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশভঙ্গি।

তার মা যে রীতিমত অভদ্র, আজ আর এ বিষয়ে রূপালীর বিন্দুমাত্র সংশয় রইল না। কি আশ্চর্য্য! এতগুলো কাঁচের থালা থাকতে একটা অমার্জিত কাঁসার রেকাবিতে খাবার দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর ওপর ভুক্তাবিশিষ্ট যে কতকক্ষণ থেকে এ ভাবে প'ড়ে রয়েছে, কে জানে! চায়ের কাপ্‌টাও রূপালী লক্ষ্য ক'রে দেখল, বিশেষ সুবিধার নয়। কেন, তার বাবার কাপ্‌টা দিলেই তো হ'ত। বাবা অবশ্য সকলের সেটায় চা-খাওয়া পছন্দ করেন না, কিন্তু মাধুরী বোস এম. এ, বি. টি. কি সকলের মধ্যে?

মাধুরীদি সোৎসুকে এই মেয়েটিকে দেখছিলেন। চুলগুলো কপালের ওপর থেকে টেনে বাঁধা, মুখটা পরম গম্ভীর। মেয়েদের এ বয়সে রীতিমত চঞ্চল আর হাসিখুশি হ'বার কথা, কিন্তু এ মেয়েটির ভাবগতিক যেন একটু অদ্ভুত। বিবর্ণ মুখে তার কৈশোরের পবিত্রতার ছায়া পড়েছে, কিন্তু মসৃণ ললাটে আধ-জাগ্রত চিন্তার ছবি। স্বচ্ছ চোখে দূরাগত যৌবনের দীপ্তিরশ্মির একটা সূক্ষ্ম আভাস দেখা যায়, কিন্তু সরল অধরোষ্ঠ শিশুর মত সুকুমার।

রূপালী মায়ের দিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপর থালা ও গ্লাসের দিকে ভ্রূভঙ্গি করল, কিন্তু তার মা কিছু বুঝতে পারলেন না। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত সাদাসিধে ধরণের। তাঁর মেয়ের মনে যে শালীনতা, সেটা তাঁর মনে বিরল।

মাধুরীদি প্রসন্ন হাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কি বই পড় ? মুহূর্ত্তে রূপালীর চোখে আগ্রহের আলো জ্ব'লে উঠল। দ্রুতভাবে সে যে বই পড়া হয় সেসব এবং যে বই কেবল বইয়ের তালিকাতে থেকেই ক্ষান্ত, তাদের নামাবলী ব'লে গেল। পুস্তকের সংখ্যা আরও বাড়াতে পারলেই যেন বেঁচে যায় সে। গৌরবটা যেন পুস্তকের সংখ্যানুযায়ী হ'বে।

ভালবাসা চাই, ভালবাসা ! একটা জীবন্ত মানব-মন প্রেম ভিন্ন বাঁচতে পারে না। যদিও বা পারে, সে মরণের সমতুল্য জীবন। হৃদয়ের প্রতিটি বৃত্তি যখন উন্মাদ বাসনায় নৃত্য করে, যৌবনের আগমন নিজের জয়যাত্রা আরম্ভ করে, তখন মন চায় একটা আধার, যার ওপর তার এই পুঞ্জীভূত সঞ্চয় ব্যয় করতে হ'বে।

মাধুরীদি তাকালেন তার দিকে। এবারে একটু মনোযোগ খরচ ক'রে। মেয়ে নিয়ে কারবার তাঁর, মেয়েদের অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখতে পান বা চান ! এক নিমিষে চিত্ত তাঁর বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল—এ মেয়েটি তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। এক-একটা মানুষের মন থাকে এই রকম, তারা অন্যের চিত্তে নিজের আসন দেখতে ভালবাসে ; সে রকম কোন সম্ভাবনা দেখতে পেলে তার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করে ; হয়তো মাধুরীদিও সেই জাতীয়।

নানা কথার পর মাধুরীদি বিদায় গ্রহণ ক'রে উঠলেন। যাবার সময়ে রূপালীর মাকে ব'লে গেলেন, একা থাকি—আমি আর আমার মা। মাঝে মাঝে আপনার মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেবেন। আমার মা বড় ছেলেপিলে ভালবাসেন।

এই কথাতেই রূপালীর মন আশা ও আনন্দের সপ্তম স্বর্গে অধিরোহণ করল। তার কল্পনাপ্রবণ চিত্ত মনে মনে মাধুরীদির

আদেখা গৃহীশ্রমের ছবি আঁকতে লাগিল নিজের ইচ্ছামত রূপে। মাধুরীদি! তাঁর ঘর ভাবতেই রূপালীর মনে হ'ল একখানা ঘর, যার মেঝে বেশ পালিশ শানে বাঁধানো, তাদের শোবার ঘরের মত। কাকা ও ভাইদের ঘরের মত ফাটা ভাঙা নয়। ঘরে কি থাকবে? কি থাকা উচিত? খাট একটা, টেবিল চেয়ার তো বটেই, আর বই—রাশি রাশি বই। সে কি কথা কইবে? এমন কিছু বলবে, যাতে সবাই একেবারে অবাক হয়ে ভাববেন, কি আশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী মেয়েটি! কি বিদ্যার দীপ্তি এর সর্ব্বাঙ্গে ঝকমক করছে! আর মাধুরীদিকে দেখাতে হবে, সে ছোট ব'লে চরিত্রের গৌরবে কারুর চেয়ে কম নয়। তার চরিত্র সত্যে পূত, উদার। সে দেখবে সাধারণ আর সব মেয়েদের মত সে নয়, তার মধ্যে অসামান্যতা আছে। সে কালে মহিলা রবীন্দ্রনাথ হ'বে অথবা মধুসূদন দত্ত হ'বে। এই দু'জনের লেখা তার থার্ড ক্লাসের বাংলাতে বেশি বেশি পড়তে হ'ত তাই এই দু'টো নামই তার দ্রুত মনে এল।

আচ্ছা, মাধুরীদি কি তাকে ভালবাসেন? তা না হ'লে কেন তাকে ডাকবেন? অনেক তো ছাত্রী আছে তাঁর?

ভাবতে ভাবতে শ্রান্ত রূপালী বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল। লাভের মধ্যে তার রাত্রিতে খাওয়া হ'ল না।

দিন দুই পরে মাধুরীদির বাড়ি থেকে লোক এল একখানা চিঠি নিয়ে। রূপালীর মাকে 'মাননীয়া' সম্বোধন ক'রে মাধুরীদি চেয়েছেন কয়েকখানা বই সময় কাটে না ব'লে, আর—রূপালীকে একবার যেতে বলেছেন।

রূপালী আনন্দে প্রায় নৃত্য ক'রে উঠছিল, হঠাৎ নিজের

সম্মান ও সম্ভ্রম মনে পড়ায় আত্মসংবরণ করলে। সত্যি, এতে কোনও সন্দেহ নেই, মাধুরীদি তাকে পছন্দ করেন।

মা রূপালীকে বললেন, যা না রুলি, তোর মাধুরীদির বাড়ি কয়েকখানা বই নিয়ে। চাকর তো দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

চাপা গলায় রূপালী মাকে তিরস্কার করলে, হ্যাঁ, যা না ওঁর চাকরের সঙ্গে! কেন, আমাদের চাকর কি নেই? কি ভাববেন তাতে! আর আমার এখন কাপড় ছাড়া হয় নি।

মা অবাক হলেন, বললেন, ভাববেন আবার কি? তোর যত সব ইয়ে। কাপড় ছাড়তে কত আর সময় লাগবে? চুল তো বাঁধাই আছে।

না না।—সবেগে রূপালী প্রতিবাদ ক'রে উঠল, এ রকম চুল বেঁধে আমি যাব না।

নানা কথার পর অবশেষে রূপালী গেল মাধুরীদির বাড়ি। তখন কলকাতার গলিতে গলিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে উঠেছে, গগনের প্রান্তে নেমেছে সন্ধ্যা।

রূপালীর ডাইরি।

'সব দেখে হতাশ হলাম। আড়ম্বরহীন গৃহসজ্জা, তার মাঝে মাধুরীদি ব'সে আছেন। চোখে তাঁর চশমা নেই, কাপড় সাধারণভাবে পরা। কেমন যেন আমার ভাল লাগল না। উনি বাইরে এক রকম, ভেতরে আর এক রকম। মনে হয় না যে, এই লোককে বাইরে এত ভাল লাগে। মাধুরীদির মাকে দেখে প্রথমে আমি তাঁকে বাড়ির ঝি মনে করেছিলাম, পরে বুঝলাম মাধুরীদির মা। মাধুরীদি নিজে বোধ হয় রান্না করেন, হাতে তাঁর হলুদের দাগ। আমাকে ছাদে বেড়াতে নিয়ে গেলেন,

তারপর খাবার খাওয়ালেন। আমার ভাল লাগল না। আমি চ'লে এলাম।'

আশ্চর্য্য রূপালী, তুমি সত্যই আশ্চর্য্য! মানুষের ভেতর দেখে কবে বিচার করতে শিখবে তুমি? কেবল বাইরে দেখে বিচার করায় 'প্রেম' তোমার ভাগ্যে কতবার লাভ হয়েছে, যদিও প্রেমের জন্যেই তুমি তৈরি হয়েছিলে? মাধুরীদি যতক্ষণ তোমার চোখে রঙিন-বসন-পরা, আত্মসর্ব্বস্ব ফুলপরীটি হয়ে রইলেন, ততক্ষণই তুমি তাঁর জন্যে ব্যাকুল, আকুল হ'লে; আর যখনই তিনি তাঁর শৌখিন খোলসটা ফেলে ধূলার ধরণীতে নেমে এলেন অন্য দশটা বাংলা দেশের মায়ের মেয়ে-রূপে, হাতে রান্নাঘরের ছাপ নিয়ে, তখনই তিনি হ'লেন তোমার কাছে সাধারণ। তোমার কাব্যলোকের স্তর থেকে যেই তোমার দেবতা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পরিচয়ে নিবিড় হয়ে উঠল, অমনই তুমি তাকে বেদীচ্যুত করলে। তুমি চাও নূতনত্ব, মোহের আবরণে চোখকে রঙিন রাখতে। পুরাতনের স্বাদ তোমার ভাল লাগে কই? মেয়েদের এমন মন হওয়া ভাল নয়, রূপালী!

ভাল কথা; এই সময়ে রূপালী সবেগে কাব্যচর্চ্চা আরম্ভ করেছিল। এই উদীয়মানা কবির লেখা তার স্কুল-ম্যাগাজিন-ভূষিত ক'রে বার হ'ত এবং সহপাঠিনীদের ঈর্ষাপ্রশংসা সমভাবে লাভ করত। এই সময়ে তার লেখা একটা কবিতা তুলে দিলে তার মনের অবস্থা বোঝানো যাবে।

রূপালীর ডাইরি—

'এস না নামিয়া প্রিয়া মরধরণীতে,
কল্পনার ফুল তুমি থেকো নীলাকাশে,

এস না নিকটে মম নিঃশেষ প্রকাশে.
শুকায়ে যাও গো যদি ধরার বাতাসে।
আমি জানি নও তুমি অত মনোরম,
আমি যা এঁকেছি ছুটি মুগ্ধ আঁখিপাতে,
কাছে এলে প্রতিক্ষণ ম্লান তব রূপ,
স্বপনের অবসান ধূলার আঘাতে।'
সম্বোধনটি লক্ষ্য কর—'প্রিয়া,' 'প্রিয়' নয়।'

রূপালী যখন স্কুলে যেত তখন তার শরীর পূর্ণতা লাভ করে নি একেবারে। তার ছিল দেহ, যে দেহ যৌবনের আগমনমাত্রে উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত হয়ে দু-চার বছরে নিজেকে ব্যয় ক'রে ফেলে না। তার দেহ যৌবনের আভাস দিত, ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে ওঠার একটা আভাস দিত, যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করবার আভাস দিত। তখন রূপালী ছিল না সুন্দর, যাকে সাধারণ মাপকাঠিতে 'সুন্দর' বলে।

সুন্দর, সুন্দর কাকে বলে? জানি না, তোমাদের মাপকাঠি কেমন? আমার চোখে সেই ক্ষীণকায়া, কালো,—তখন রূপালী স্বাস্থ্যের আমেজ পেয়ে রক্তহীন ফরসা থেকে রক্তবান শ্যাম অর্থাৎ কালোতে প্রোমোশন পেয়েছিল—সেই কালো মেয়েটির তুলনা ছিল না। আঠারো বছর পর্য্যন্ত সে আমার কাছে ছিল শিশু। দেহবাদ তার পবিত্র মনকে কলুষিত কখনও করে নি। তার ভালবাসা ছিল তারই মত পবিত্র, তারই মত সুন্দর, তারই মত অদ্ভুত। বহুবার ভালবাসা নিয়ে গবেষণা করবার ফলেও সে তার পবিত্রতা হারায় নি। শিশুর মন ছিল তার, নবজাগ্রত কৌতূহলে পূর্ণ।

জীবনে আমি সুন্দর দেখেছি অনেক। নিজের চেহারারও সুন্দর ব'লে খ্যাতি আছে। কিন্তু রূপালীর কালো চোখের ভঙ্গিমায়, সুকুমার অধরের ঈষৎ কম্পনে যে অনন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার আমি দেখতাম, তার তুলনা কোথাও খুঁজে পাই নি।

রূপালীর স্কুল-জীবন শেষ হ'ল প্রায় সতরো বছর বয়সে, কিন্তু তার আগে আরও কয়েকটি ঘটনা আমার জানানো দরকার। রূপালীর প্রেমনদী উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছিল, সমুদ্র হ'ল তার সেকেণ্ড ক্লাসের ক্লাস-শিক্ষয়িত্রী চম্পা গুহ।

চম্পা গুহের বয়স তখন বত্রিশ। নিকষ-কালো না হ'লেও দগ্ধ কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ। দেহ, মুখ, চোখ লালিত্যবিহীন, রুক্ষ। এক গোছা সোজা চুল। রূপালীর চোখে তাঁর তুলনা ছিল না, শুধু গুণে নয় কেবল, রূপেও।

চম্পা গুহ দরিদ্র গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে। কোন রকমে বি. এ পাস ক'রে নিজের সংস্থান নিজে করবার জন্যে স্কুলে চাকরি নিয়েছেন। মন তাঁর রুক্ষ, কর্ত্তব্য ক'রে যান কঠিনভাবে। রসের লেশ নেই মনে তাঁর। তাঁরই মধ্যে রূপালীর প্রেমের অলকানন্দা মুক্তি পেল। কি বোকা মেয়ে!

রূপালী চম্পা গুহের ক্লাসে তন্ময় হয়ে ব'সে প্রতিটি কথা তাঁর সারা দেহ মন দিয়ে যেন গিলত। ফলে ইতিহাসে, তখন ক্লাসে কেন, সারা স্কুলে তার জোড়া ছিল না। চম্পা গুহের প্রতিটি আদেশ রূপালীর বেদবাক্য। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে বুকের মধ্যে কম্পিত হওয়া, পদধ্বনিতে হৃদস্পন্দন দ্রুত হওয়া সবই দেখা দিল। এ প্রেমে আর পরবর্ত্তী জীবনে পুরুষের প্রতি প্রেমে প্রভেদ কি?

এ সময়ে আবার রূপালীর প্রতি অনুরাগী দুই-একটি পুরুষ দেখা দিল। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, মানবতায় সুকুমার মুখ যে মেয়ের অসহায় বড় চোখে যার স্বপ্নাকুল দৃষ্টি, সে অন্য সব মেয়ের চেয়ে বহু—স্বতন্ত্র, যার কোরক-চিত্তে লালসা বা সাংসারিকতা স্পর্শ করে নি, সে তো লুব্ধ পুরুষের তৃষিত দৃষ্টিপথে পড়বেই। আহা, কি অনাস্বাদিত তাজা ফল। আমার দশনের চিহ্ন এতে পড়ুক না কেন! এই গাছে-ফোটা কচি ফুলটি কেন বাসনার স্পর্শ পাবে না।

ঘৃণা! ঘৃণা! নরম ফুলতোলা কার্পেটের ওপরে রূপালীর অসহিষ্ণু চরণ ন'ড়ে উঠল। দু'হাত মাথার পেছনে রেখে রূপালী ওপরে আলোর আধারটার দিকে চাইল। এই দেহ! সরস, স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল, ক্ষীণ! বিশাল নয়ন! কি আকর্ষণ তার? সাধারণ মেয়েদের চেয়ে ভাল দেখতে সে নয়। সুন্দরীদের পাশে সে কুশ্রী। তবু এই দেহের আকর্ষণে আমার পেছনে আসত পুরুষ—পঁচিশ বছরের রূপালীর দেহ স্মরণ ক'রে চল্লিশ বছরের রূপালী ভাবছে। তা ছাড়া, কি আকর্ষণ ছিল আমার? একটা বোকা মেয়ে কৈশোরে। কথা বলতে জানে না, হাসতে জানে না, সঠিক-ভাবে কটাক্ষ বা ক্রন্দন শেখে নি। শিখেছে কেবল ক্লাশে পড়ে ফার্স্ট হ'তে—দু-একটা বাজে তৃতীয় শ্রেণীর তরল কবিতা লিখতে, আর—আর স্বপ্ন দেখতে।

একজন আসত, এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। ছাত্রাবাসে থাকত সে। একলা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করার জন্যে ক্লান্তি এসেছিল তার। আর সে তার বোনের জা—রূপালীর মাসীমার কাছে রূপালীর প্রশংসা শুনে পূর্ব্বরাগের ভাব মনে নিয়েছিল। মন্দ কি!

রূপালীর ভালমানুষ মা মেয়ের কবিতার খাতা বার করলেন দেখাবার জন্যে। ডান হাতে সন্দেশ চিবোতে চিবোতে রূপালীর খাতা হাতে ধ'রে রতীন্দ্র পড়ল।

বাঃ, বেশ তো লিখেছে বয়েস আন্দাজে! এক সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ আছে আমার। দুটো লেখা তাকে দেবো ছাপাতে।

রূপালীর মন আনন্দে নেচে উঠল। তার নাম ছাপা হবে কাগজে, তার কবিতার লাইন সহস্র লোক পড়বে!

রূপালীর বিহ্বল ভাব দেখে রতীন্দ্র আরও একটু আত্মপ্রাধান্যে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। রূপালীকেই উদ্দেশ ক'রে কথা চালাল সে, বুঝলে, 'চিত্রিতা' কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আর ওর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বিমানবাবু তো আমার মেসে থাকেন। তাঁদের দুজনকে ব'লে ক'য়ে দেব চালিয়ে।

রূপালীর মনে একটু বেসুরো বাজল। কেন, তার লেখা কি এমনই অচল যে বলে ক'য়ে চালাতে হবে। রতীন্দ্র বলছে অনুগ্রহ করার ভাবে!

রূপালীর মা চা ভিজোতে দিয়ে এসেছিলেন, উঠে গেলেন।—

রূপালীর সঙ্কুচিত মুখের দিকে চেয়ে রতীন্দ্র আধুনিক সাহিত্য ও প্রেম সম্বন্ধে নানা আলোচনা করতে লাগল। তার সঙ্গে নিজের মনোভাবও জানাতে দ্বিধা করল না ইশারা-ইঙ্গিতে।

মোটা ভাঙাগলা লোকটার, জলে ভেজা তবলা যেন। চেহারার মধ্যে স্বাস্থ্য আছে, রূপ নেই। তামাটে বর্ণ, একজোড়া প্রবল গোঁফ। রসে হাত পড়লে হাত যেমন চটচটে হয়, তেমনই একটা বাজে ভাবপ্রবণতা, এবং তার সঙ্গে একান্ত নির্লজ্জপনা। কি এক অজানা মনোভাবে, বিতৃষ্ণায় ও গা-ঘিনঘিন—করাতে

রূপালী অস্থির হয়ে উঠল। এই লোকটা তার সঙ্গে যে ব্যবহার করছে যেন সেটা স্পর্দ্ধা ও অপমান।

তাই যাবার সময়ে কবিতা চাইলে রূপালী তা দিল না এবং সেজন্যে মায়ের কাছে তিরস্কৃত হ'ল।

তারপর রতীন্দ্র আসতে লাগল ঘন ঘন। ক্রমেই বিতৃষ্ণা বাড়তে লাগল রূপালীর। শিশুকাল থেকে প্রেমে পড়া যার অভ্যাস ছিল, প্রেমার্ত্ত পুরুষকে তার প্রত্যাখ্যানের মর্ম্ম অন্ততঃ আমি বুঝি নি। যেসব পুরুষকে দেবতার আসনে বসিয়ে ছিল রূপালী তাদের চেয়ে রতীন্দ্র বিশেষ কিছু ন্যূন ছিল না। তবে রতীন্দ্রের সঙ্গে রূপালীর বিবাহ হতে পারত—রতীন্দ্র সে আভাসও দিয়েছিল। বিবাহের মত স্থূল একটা বস্তুর সম্পর্কিত পুরুষকে তাই বোধহয় রূপালীর বিশেষ ভাল লাগেনি। তার কবি-মন মানসলোকে বিচরণ করে ফিরত, একজন সামান্য সাধারণ পুরুষের কল্যাণে শাঁখা-সিঁদুর ধারণ ক'রে তার অঙ্কশায়িনী হবার কল্পনাটা রূপালীর তরুণ চিত্তে যেন সহসা আঘাত দিল। আভাসে ইঙ্গিতে প্রেম নিবেদনের প্রচেষ্টাও করেছে রতীন্দ্র। যদি সে রূপালীর জীবনে সমসাময়িক অন্যান্য পুরুষের মত রূপালীকে প্রেমের চক্ষে না দেখে স্নেহের চক্ষে দেখত, তবে বোধহয় রূপালীর প্রেমনদী তাকে ঘিরে উদ্বেলিত হ'তেও পারত।

মাসীমার মুখে রতীন্দ্র বিবাহ-প্রস্তাব পাঠিয়েছে শুনে রূপালী কেঁদে হাট বসিয়ে দিল, যদিও তার বাবা-মা এখন মেয়ের বিয়ে দেবেন না ব'লে আগেই 'না' করে দিয়েছিলেন। মনে হ'ল রূপালীর, তার জীবনে বুঝি চরম অবমাননা এসেছে প্রথম পুরুষের বিবাহ-প্রস্তাবরূপে। বাবা-মার সামনে বার হ'তেও যেন তার সঙ্কোচ হচ্ছিল, তাঁরা কি ভাবছেন ভেবে। শিশুর মত যে ছিল এতদিন, রাতারাতি তাকে যুবতীরূপে কামনা ক'রে যে ব্যক্তি

তার মনোজগতে বিপ্লব আনল, জীবনে কখনও তাকে রূপালী ক্ষমা করতে পারে-নি। বিষণ্ণ ভাব দেখে মা তাকে বোঝালেন, একে রতীন তোর সম্মান করেছে, রূলি। অপমান করে-নি। সম্মান না করলে কি কেউ কাকে বিয়ে করতে চায়?

উত্তরকালে এ কথা রূপালীর জীবনে বহুবার মনে করতে হয়েছিল।

এর মধ্যে ম্যাট্রিক ক্লাশের সান্ত্বনার সঙ্গে আবার রূপালীর মনোমিলন হ'ল। পাতলা, হ্যাংলা চেহারার মেয়েটি সহসা এক-রাত্রির মধ্যে রূপালীর চক্ষে অসামান্যা বলে প্রতীয়মানা হ'ল। স্কুল থেকে কয়েকজন মেয়েকে 'পিট্যার প্যান' দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, রূপালী দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীরূপে সেখানে গিয়েছিল। সান্ত্বনা তার পাশের আসনে বসেছিল। ওয়েণ্ডি যখন ছায়ার পেছনে ধাবন করছে, তখন সান্ত্বনা রূপালীকে প্রশ্ন করলে, কি লাগছে কেমন?

সঙ্গে সঙ্গে রূপালীর স্বপ্নে-তৃপ্ত চিত্ত পরম পুলকে মগ্ন হ'ল। সান্ত্বনা চক্রবর্ত্তী অত মেয়ের মধ্যে বিশেষ ক'রে তাকে কেন জিজ্ঞাসা করল! শক্ত ক'রে লাগানো চেয়ারে যতটা সম্ভব স'রে এসে সান্ত্বনার হাতখানা ধ'রে বিগলিত স্বরে রূপালী বললে, বেশ ভাল দেখাছ। আপনি?

সেই হাত রূপালী আর ছাড়ল না, সান্ত্বনা মাঝে মাঝে ছাড়াবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও। কেমন যেন একটা সুখস্রোত তার হাত বেয়ে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছিল। শারীরিক সংসর্গের এই তার প্রথম ধারণা। উষ্ণ করতল সান্ত্বনার, একটা আরাম যেন স্পর্শমাত্রেই দেহকে আশ্রয় করে।

তারপর সামান্য কয়েকদিন সান্ত্বনার পশ্চাৎধাবন করেছিল

রূপালী, জানি। যেখানে সান্ত্বনা রূপালী সেইখানেই দেখা দিত। সান্ত্বনার গায়ের সঙ্গে একটু ছোঁয়া লাগা তার কাম্য ছিল তখন। সহপাঠিনীরা রূপালী ও সান্ত্বনার নাম জড়িয়ে নানা হাসিঠাট্টার উপাদান কুড়িয়ে ফিরতে লাগল। তাতে রূপালীর আনন্দ দেখা দিত। সে সান্ত্বনাকে যে ভালবাসে, সে সংবাদ সকলকে জানানো তার গর্ব্ব, সে কথা অন্যের মুখে শুনেও তার তৃপ্তি।

এ সাফো-প্রেমের শেষ কেমন করে হ'ল জানি না। রূপালীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলেছিল তারও মনে নেই।

এই সময়ে রূপালীকে উদ্দেশ ক'রে নীচু ক্লাশের কয়েকটি মেয়ে কবিতা লিখেছিল। ভাল ছাত্রী ও কবি ব'লে স্কুল-জীবনে রূপালীর খ্যাতি তখন বহুদূর বিস্তৃত। তাদের কথা নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই; কারণ রূপালীর চিত্ত-উন্মেষ আমাদের লক্ষ্য, অন্যচিত্ত তাকে বেষ্টন ক'রে উন্মেষিত হয়ে উঠলেও, সেটা আমাদের প্রতিপাদ্য নয়। তবে রূপালীর মনে তখন একটু পুরুষসুলভ ভাব এল। সেই সব মেয়েদের দেখিয়ে সপ্রতিভভাবে চলাফেরা, অহেতুক তাদের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার, তাদের চক্ষে নিজেকে বড় ক'রে দেখানোর উদ্যম তার দেখা গেল। পুরুষালী ভাবে চলাফেরা করতে গিয়ে রূপালীর এলায়িত ভাবটা কেটে উঠে সপ্রতিভ চটপটে ভাব এসে গেল, যাকে বলে—স্মার্টনেস, পরবর্ত্তী জীবনে তা রূপালীর একটা প্রধান আকর্ষণ হয়েছিল।

রূপালীর জীবনে নারীপ্রেমের অধ্যায়ে এখানে ইতি। তারপর থেকে এল তার জীবনে পুরুষ—সহস্র পুরুষ। ক্ষণিকের জন্যে জীবনে ছায়া ফেলে তারা এসেছিল এক এক ক'রে, কেউ থাকে নি, কিন্তু স্মৃতি র'য়ে গেছে। যাকে রূপালী

পরমপ্রার্থিত ব'লে সাগ্রহে একদিন কাছে টেনে এনেছিল, যখন তার বিসর্জ্জন হয়ে যায়, রূপালী তার জন্যে শোচনা করে না। সুখস্মৃতি তার হৃদয়ে সযত্নে রক্ষিত থাকে,—দৃষ্টি তার তখনই দ্বিতীয় জনের সন্ধানে ছুটে চলে। এটা রূপালীর বিশ্বাসঘাতকতা নয়, এ তার চরিত্রের গঠন।

মাসতুতো দিদির ননদের বিবাহে গিয়ে রূপালী এবার প্রেমে পড়ল বিয়ের বরের সঙ্গেই। ভদ্রলোক শ্যামবর্ণ, সুস্থসবল। অল্পবয়স্কা কিশোরীর সঙ্গে বরজনোচিত রসিকতা করেছিলেন। কথাবার্ত্তা ভদ্রলোক কম বলেন, আচার-ব্যবহার শান্ত। রূপালী ধ'রে নিলে তাঁর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। ভদ্রলোকও রূপালীর শিশু-সুলভ সারল্য দেখে মোহিত হলেন। শালগ্রাম সামনে রেখে মন্ত্র প'ড়ে স্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেও আলাপটা তখনও চাক্ষুষ ছিল। তাই বিয়ের বরের সার্ব্বজনীন রসিকতার সুযোগ নিয়ে তিনি রূপালীর সঙ্গে একপালা প্রেমালাপ ক'রে নিলেন।

মুগ্ধা রূপালী ভাবতে লাগল—মণিদির ননদের কি ভাগ্য! এমন রসিক পুরুষ সর্ব্বদা তার পাশে থাকবে! এই অখণ্ড পুরুষরত্ন তার একলার হ'বে!

পরের দিনও সাগ্রহে বিয়ে-বাড়ি গেল রূপালী, বাড়িটা তাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে। যাবার সুযোগ পেতে পেতে বেলা তিনটে বেজে গেল। কুশণ্ডিকা তখন হয়ে গেছে। শ্রান্ত নব-বর যৌতুকের খাটের ওপর শুয়ে ছিলেন। মেয়েদের সঙ্গে দু-চারটি কথার পর রূপালীকে দ্বিতলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, কারণ বরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার লোকের অভাব ঘটেছিল।

ভদ্রলোক পাশবালিশ জড়িয়ে ধ'রে রূপালীকে সম্বোধন করলেন, এই যে, এস। এতক্ষণে আসা হ'ল ?

চকিতে রূপালীর মনে হ'ল, সে যেন নবপরিণীতা, তার স্বামী তার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে অসহিষ্ণু হয়েছেন। তার পরেই আপাদমস্তক লজ্জায় তার সর্ব্বশরীর শিহরিত হ'ল। বিবাহ ? এমন একটা স্থূল বস্তুর কথা তার মনে এল কি ক'রে ? অথচ অন্যের স্বামীকে কামনা করবার লজ্জার কথা ভাববার তার অবকাশ হ'ল না। তখনও স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হয় নি, কাজেই তখনও তো তিনি কুমার।

সে ভাবটা দমন ক'রে রূপালী একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। অর্দ্ধশুষ্ক ফুলের মালা, ফুল ইতস্তত সারা ঘরে ছড়ানো। নূতন জামা-কাপড়ের কেমন একটা গন্ধে, কেশতৈল, পুষ্পসার সব কিছুর সৌরভ মিশে জায়গাটিকে যেন অন্য একটা রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। সদ্য পালিশকরা খাট-টেবিল, আলনায় পাদানে সাজানো নূতন জুতো, চামড়ার সুটকেশ, নূতন কাঁসা-রূপোর বাসনপত্র। খসখসে গরদের পাঞ্জাবি, জরিপাড় ধুতি জড়ানো গায়ে, নরম পুরু শয্যায় মোটা পাশ-বালিশ আঁকড়ে শুয়ে আছে শ্রান্ত পুরুষ। পদার্পণ করা মাত্র দেহমনে যেন লালসার ভাব আসে। আমাদের দেশে বিবাহ-বাটির বৈশিষ্ট্য এই। যাদের পূর্ব্বে কখনও পরিচয় ছিল না, রাতারাতি তাদের এক করার প্রয়াসে সহায়তা করে উগ্র আলোকমালা, সানাইয়ের মধুর স্বরলহরী, রক্তাম্বরের প্রখরতা।

কি ভাবে এই পুরুষটি তার স্ত্রীকে সুখ দেবে ? এই একটি খাটে পাশাপাশি তারা শয়ন করবে! এমনই আদরের সুরে স্বামী স্ত্রীকে কাছে ডেকে নেবে। দৃঢ় বাহুর পীড়নে যেমন ক'রে আজ ভদ্রলোক বালিশকে পীড়ন করছেন, তেমনই ক'রে

বুঝি নারীকে আলিঙ্গন করবেন। উষ্ণ শয্যায় পুরুষের বাহু-বন্ধনে না জানি কি সুখ? সহসা রূপালীর মনের উপর বাসনা ছায়াপাত করলে। শারীরিক প্রেম সম্বন্ধে এই তার প্রথম অনুভূতি।

দেহে রোমাঞ্চ জেগে উঠল রূপালীর। মিথ্যা একটা অজুহাত দিয়ে রূপালী উঠে গেল নিরালাতে তার এই নবলব্ধ অনুভূতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে।

তারপর থেকে রূপালীর আরম্ভ হ'ল চিত্তদ্বারে কামনার অভিযান। সে ছিল কল্পনাবিলাসিনী, তাই মনে মনে যে সব আলোচনায় হ'ত তার তৃপ্তি, তা সাধারণ মেয়েদের শারীরিক তৃপ্তির সমান। তাই কাম সম্বন্ধে সজাগ হ'লেও রূপালী শারীরিক সুখের অভিজ্ঞতা লাভে উৎসুক হ'ল না। কেবল গভীর রাত্রে চোখে তার ঘুম যখন আসত না, তখন সে ভাবতে থাকত স্ত্রীপুরুষের যৌন-মিলনের কথা। তার মুদিত চোখের সামনে সে কল্পনা করতে থাকত, কত তরুণ-তরুণীর গোপন অভিসার, কত দৈহিক প্রেমের খুঁটিনাটি দৃশ্য। কল্পনা হ'ল তার তীব্র, দেহ নির্লিপ্ত। জীবনে কোন দিন রূপালী দৈহিক মিলনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব ক'রে পুরুষের কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে নেয় নি। মনের কল্পলোকে তার বহু প্রিয়ের সঙ্গে সে বহুবার মিলিত হয়েছে গোপনে।

ধীরে ধীরে রূপালীর বাবার অবস্থা ভালো হচ্ছিল। এবারে গ্রীষ্মের সময়ে তিনি একমাসের জন্য দার্জ্জিলিং যাওয়া স্থির করলেন রূপালী আনন্দে প্রায় নৃত্য করে উঠ্‌ল। এই সময়ে তার মনে পুরুষদের সঙ্গে মিশবার এক প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল। তখনো চিত্ত তার শিশু, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গ আর যেন ভাল লাগে না।

কোনো সুপুরুষকে দেখলেই তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়, তার কথা ভাবতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বিশেষ সুযোগ নেই। ভাইয়েরা ছোট, তাদের বন্ধুবর্গও তাদের সমতুল্য। কাকা বাইরে থাকেন সহচরদের নিয়ে। মধ্যবয়সী, অতি সাধারণ দুই-চারিটি আত্মীয় ভিন্ন অন্তঃপুরে বিশেষ কেউ আসে না। রূপালীর বাবার অন্তঃপুর ও বহিরঙ্গণ সম্বন্ধে প্রবেশ সূক্ষ্ম। মাঝে মাঝে দেশে তারা যেত, তখন আশেপাশের প্রতিবেশী কিশোরদের সঙ্গে কিছু মেলামেশা করতো রূপালী, মনে মনে তাদের নিয়ে কল্পনার বিলাসও হোত। কিন্তু, বিশেষ কিছু রূপ নেবার পূর্বেই সে ফিরে আস্ত কলিকাতার ইটকাঠে। প্রতিমার গঠন না হতে হতেই দিতে হত বিসর্জ্জন, অর্চ্চনার অবকাশ পাওয়া যেত না।

ঈশ্বর রূপালীকে রক্ষা করেছিলেন তখন পর্য্যন্ত রূপহীন দেহ দিয়ে। স্বাস্থ্যের অভাবে সৌন্দর্য্য তার যা ছিল তারও বিকাশ ঘটেনি! তার ওপর সাজসজ্জা সম্বন্ধে সে ছিল উদাসীন। পিঠের ওপর কানাড়াছাঁদের বেণী দুলিয়ে, কপালে কুম্‌কুম্ এঁকে কটাক্ষ ভঙ্গিমার চিত্তজয়ে তার রুচি ছিল না। সে ছিল অত্যন্ত লাজুক, দূর থেকে প্রণয়াস্পদের দিকে চেয়ে থেকেই তার দিন কেটে যেত। নির্ব্বাক লজ্জানতা এই মেয়েটির দিকে চেয়ে মনেও হত তার অন্তরে তখন সুরাসুরের মন্থন চলেছে। তাই সেই সব গ্রাম্য যুবকেরা তার বিষয়ে কোনো কৌতূহলই পোষণ করেনি, তার শুভ্র সতীত্বে রেখাপাত করবার চিন্তাও কারো মনে আসেনি। নহ'লে বেশী শিক্ষাহীন, প্রকৃতির অবাধ প্রাচুর্য্যের মধ্যে যারা মানুষ হয়েছে, কামনা তাদের মনে আসে বেশী। শহরের কৃত্রিমতার বাহিরে জীবন হয় সরল। বনানীর শ্যাম-নিকুঞ্জে পাড়া-বেড়ানোর ছলে মিলন কঠিন নয়।

অবশ্য আমি জানি—আমার মত করে কে আর রূপালীকে

জানে—রূপালী কখনো আত্মদান করতো না। তার মনে বিবাহ বা অন্যকিছুর প্রবৃত্তি আসেনি। সে শুধু মনে মনে কল্পনার জালই বিস্তার করল। দৈহিক তৃপ্তির প্রচেষ্টা ছিল তার স্বপ্নের সীমানার বাইরে।

রূপালীর ডাইরি—

'মনে হয় এখানে কি শান্তি! চিরজীবন আমি এই পল্লীগ্রামে থাকতে পারি। সামনে ছোট জলা গিয়েছে গ্রামের শেষে 'চলন-বিলের' দিকে। সবুজ ঝোপ ও গাছ কি ছায়া-শীতল! বাগানে ঝুম্‌কো জবা নিজের মনে দুলছে। আকাশে নীল অপরাজিতার রং। নীলের বক্ষে শুভ্র মল্লিকামালার মত বকের সারি উড়ে যাচ্ছে। সমস্ত প্রকৃতি নিরালা বিশ্রামে ঘুমন্ত। কলিকাতার ইটকাঠের স্তূপ ভালো লাগে না।

'রঙিন ফুলে প্রজাপতি
তোমার আশায় আছে বসে,
তোমার চলার পথের প'রে
বকুল যূঁথী আজো খসে।
নাচন লাগে পাতার দলে,
দীঘির ঘাটে ছায়া পড়ে,
যদি তোমার কোমল গায়ে
নিদয় লাগে রবির করে।'

উত্তরকালে তার জীবনেতিহাসের পৃষ্ঠা উলটিয়ে এই জায়গাটি আমাকে দেখিয়ে রূপালী বিদ্রূপের হাসি হেসেছিল—এই সময়ে পাশের বাড়ীর ছেলে যোগীনের সঙ্গে কিন্তু আমার দারুণ প্রেম চল্‌ছিল। তবু কবিতায় কোমল তনু একটি মেয়ে-ই দেখা দিয়ে রইল!'

আমি—তোমার ওইতো স্বভাব রূপালী। কাব্যজগতে

বাস্তবতা এনে ফেলবার দরকার তুমি বোঝ নি। আর, ও রকম লঘু ক্ষণস্থায়ী প্রেম নিয়ে কবিতা লিখবার কথা তোমার মাথায় আসে নি। এই না? তোমার সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী তাই বাইরের ছায়াতে ম্লান হল না।

রূপালী (সাশ্চর্য্যে)—ঠিক। কিন্তু তুমি কি করে জানলে?

বর্ত্তমান নিয়ে কারবার ছিল রূপালীর, ভবিষ্যৎ সে ভেবেও দেখত না। যোগীনের কথা তার ভাবতে ভালো লাগে, তার সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে, এই যথেষ্ট। দুই-চারদিন পরে যে সদর-মহকুমায় এন্‌ট্রেন্স্‌-পড়া ছেলে যোগীন মিত্রকে গ্রামের ছায়াশীতল ক্রোড়ে ফেলে রেখে রূপালী ফিরে যাবে গোপীনাথ ষ্ট্রীটের দোতালায়, তাতে তার কিছু ক্ষতি হবে না। সে আসন্ন বিচ্ছেদ—হয়তো চির বিচ্ছেদ,—রূপালীর স্বপ্নমদির দিনগুলির উপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। সে যোগীনকে বিবাহ করতে চায়, কি তার গ্রামের বাটীতে বাসা বাঁধতে চায় সে চিন্তা রূপালীর মনে ক্ষণিকের জন্যেও উদয় হ'ল না। শুধু মনে মনে সে যোগীনের পার্শ্ববর্ত্তিনী হয়ে অনুক্ষণ ফিরতে লাগলো, যেখানে সকালবেলায় পায়াভাঙ্গা টেবিলের উপর পাঠ্যপুস্তক ছড়িয়ে যোগীন উচ্চস্বরে ভুল উচ্চারণে ইংরাজি ভাষাকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করত। যেখানে গ্রামের জোলাদের বোনানো লাল গামছা কাঁধে ফেলে যোগীন সঙ্গীদের সঙ্গে পুকুর-পারে স্নান করতে আসত, সেখানে। যেখানে ধূসর সন্ধ্যার আলোতে তমসাচ্ছান্ন জলার উপর সরু ডিঙী-নৌকোর দাঁড়ক্ষেপণে যোগীন জলরেখাকে তোলপাড় করে তুলতো, সেখানে। যেখানে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথে যোগীন বাড়ী ফিরত, শুকনো সন্ধ্যামল্লিকা এক এক করে পথে ঝরে পড়ে; সহসা ঘূর্ণী বাতাস কাঁঠালগাছের পাতা স্খলিত করে

দেয়, পোষা কুকুর এগিয়ে নিতে আসে, সেখানে। রাত্রে যখন মাটীর পিলসুজে প্রদীপের আলোতে কাকীমা-প্রদত্ত অন্নব্যঞ্জন গলাধঃকরণ করে যোগীন তাদের দালানের বড় ঘরে বিস্তৃত অর্দ্ধমলিন শয্যায় শুয়ে থাকত, সেখানেও সলজ্জ অভিসারী পদে রূপালী উপস্থিত হ'ল। তারপর ?—স্তিমিত আলোর নীচে আজ রূপালীর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো !

যোগীনের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত কি হোল ? চেয়ারের মেহগিনী পিঠে মাথা রেখে রূপালী ভাবতে চেষ্টা করল। সব কথা লেখা সম্ভব নয়। সামান্য আভাস মাত্র উল্লেখ করা আছে এই খাতায়। সেই আভাস আশ্রয় করে সম্পূর্ণ কাহিনীটি মনে করে নিতে হয় যথেষ্ট সময় ব্যয় করে। পরিশ্রম ও স্মৃতিশক্তি উভয়েরই একান্ত প্রয়োজন হয়। তৃতীয় সন্তানটির মৃত্যুর পর রূপালীর আবার স্মৃতিশক্তির অনেকটাই হ্রাস হয়ে গেছে।

তবু—বিমনা রজনীতে চোখে যখন ঘুম আসে না, যখন সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা, অবিমৃষ্যকারিতা দহন আনে, তখন এই স্মৃতিই রূপালীর একমাত্র সুখ। খুলে বসে সে তার খাতা—পাতা উল্টে দেখে, আর ছায়াছবির মত অতীতকে মনের পাতায় ধরতে চেষ্টা করে। জীবনে এখন তার এই একমাত্র বিলাস।

মার্ব্বেলের ত্রিপদীতে রক্ষিত হলাণ্ডের মন্দির আকারে ঘড়ি বিচিত্র রাগরাগিণীতে রাত্রি দ্বিপ্রহর বাজিয়ে গেল। জানালার নীলাভ সূক্ষ্ম জালের পর্দ্দা রূপালী উঠে গোলাপী ফিতে দিয়ে বেঁধে সরিয়ে রাখল—রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাস নীচের কালো পীচের চওড়া রাস্তা থেকে উঠে আসল। মাথার ওপরে নিঃশব্দে ভ্রাম্যমান পাখার সুইচ বন্ধ করে রূপালী দোলানো-চেয়ারের আরাম আসনে নিমগ্ন হল। কোণের জয়পুরী মীনাকাজ-করা ফুলদানিতে রজনীগন্ধার ঝাড়—বাতাসে তারি গন্ধ।

নীচে দরোয়ান নিদ্রাজড়িত খোট্টাই ভাষায় তার কুলদেবতাকে স্মরণ করে পাশ ফিরে আবার নিদ্রাগত হল মুহূর্ত্তের মধ্যে। কেবল দড়ির খাটীয়ার একটু শব্দ শোনা গেল।

হাত বাড়িয়ে একটা ফুলের দণ্ড তুলে নিয়ে, পাথরে বিরচিত পাঁপড়ির মত শুভ্র, ঈষৎ কঠিন দলগুলি রূপালী নির্দ্দয়ভাবে পেষণ করতে লাগল। অন্য পুষ্পের মত রজনীগন্ধা নমনীয় নয়। হাল্কা-সবুজ কাণ্ডের মাথায় মাথায় বেলোয়ারী কাঁচের ঝাড়ের মত ফুলগুলি কি সুন্দর! যা ইচ্ছা সে করবে এই পুষ্প নিয়ে। এ ফুলের অস্তিত্ব কেবল একটি রজনীর। তাই এর ওপর তার সম্পূর্ণ অধিকার খাটানো চাই। একটির পর একটি দলিত ডাঁটা রূপালী ছুঁড়তে লাগল রাস্তায়। সহসা গৃহটি যেন সজাগ হয়ে উঠল।

টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে রূপালী মনে মনে হাস্‌ল। কী করেছে সে! যে তন্দ্রাকুল পরিবেশ রজনীগন্ধা সৌরভে রচনা করেছিল, সে তো রূপালীর হাতেই ধ্বংস হল। ক্ষণিকের ছেলেখেলায় মত্ত রূপালী ভুলে গেল, এই রজনীগন্ধা অগোচরে তার জন্যে গন্ধভার বহন করেছে নীরবে।

জীবনে এমনি ভুল হয়েছে। মনের অজস্র সম্পদ দুই হাতে বিলাবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু, হায়! একদা যে সে মন রিক্ত হ'বেই।

যোগীন তাকে ভালবেসেছিল কি না জানা যায়নি। জানার প্রয়োজন ছিল না। শুধু রূপালীর চকিত দৃষ্টি খুঁজে বেড়াত প্রিয়কে। পূজার মণ্ডপে 'ডে-লাইটের' তলায় পাটীতে আসীন কিশোরদের ভিড়ে যদি তাকে দেখা যেত সেদিন সার্থক হত। দেবতার প্রতি এতে ভক্তির অভাব বিবেচনা করে রূপালী সঙ্কুচিত হয়েছে। ঘাটে যাবার পথে একবার দৃষ্টি-বিনিময়;

আর কিছু চায়নি রূপালী। মনে হ'ত বুঝি যোগীন তাকে অনুসরণ করছে মনে মনে। চলাফেরা তাই তার ছন্দমুখর হয়ে উঠত, কাজ তার হ'ত খেলা। সে যেন ঠাকুরের প্রসাদ চিলতে কলাপাতায় সকলের মধ্যে বিতরণ করছে না, যেন সে বঁধুর সঙ্গে মানাভিমানের খুনসুড়ি করে যাচ্ছে। এই সময়ে রূপালীর মুখের ভাব লক্ষ্য করবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার প্রসাদপ্রার্থী জনতার মধ্য থেকে। সে মুখ আশ্চর্য্য ভাবলেশ-হীন! তাই চিরদিন তার মনের কথা অজানা থেকে যেত।

আজ চল্লিশে ভাবছে রূপালী তার পনরো বছরের জীবনের কথা। বিজয়া দশমীর পাণ্ডু জ্যোৎস্নার আভায় কাকে প্রণাম করতে দেহ চঞ্চল হয়ে উঠত? কোজাগরী পূর্ণিমার সাম্‌নে কলা-আটা মিশ্রিত সত্যনারায়ণের সিন্নী আর কাটা ফলের পরাত নিয়ে পিসীমার মুখে ব্রত কথা শুনতে শুনতে কার নিমন্ত্রণ রক্ষার প্রত্যাশায় রজতশুভ্র চন্দ্রালোকে মাটির উঠানের দিকে ক্রমাগত দৃষ্টিক্ষেপ করতে হ'ত? দেবী তাঁর কড়ির জাঙ্গাল ও সিন্দুরের কৌটো নিয়ে জলচৌকীর ওপর নির্ব্বিকার বসে থাকতেন। চিরকাল দেবতার উর্দ্ধে সে প্রেমকে স্থান দিয়ে এসেছে।

হে দেবতা! কোন তিমির রাত্রি পার হয়ে চির-রহস্যলোকে তোমার বাস জানি না। আমার জীবন নিয়ে তোমার এ লীলাখেলা আমি সমর্থন করি না। যে হৃদয় তোমার প্রেমে উন্মাদ হয়ে উঠতে পারত, তাকে কেন তুমি মানুষের ভালবাসায় বন্ধন পরালে? শৃঙ্খলমুক্ত আমার মন আজ চলে যাচ্ছে সুদূর আকাশের পথে পথে অনন্ত যাত্রায়। সে তোমার সন্ধানে কি না সে বোধ আমার নেই। নির্ব্বিকার! তুমি কি কোথাও আছ? আমি জানি তুমি কী। অদৃশ্য, অন্ধ শক্তি! নিজের

নিয়মের নাগপাশে তুমি বন্দী। তোমার হৃদয় নেই, অনুভূতি নেই। আমি তোমাকে ভালবাসব না। আমি বাসব সুখদুঃখে বিচলিত, কোমল হৃদয়ের দুর্ব্বল মানুষকে! তোমাকে আমি চাই না!

সে বছর চলে আসতে হ'ল। আসবার সময়ে কি মনোভাব হ'ল আজ রাত্রে রূপালী তা মনে করতে পারছে না। শুধু মনে আছে তার, পরের বার যেয়ে শোনা গেল যোগীন তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পাস করে মহকুমা-শহরে তার বড়বোনের বাড়ী থেকে কলেজে পড়ছে, এবারে দেশে আসবে না। আর মনে আছে তার পরের বারে বিজয়ার পর প্রণাম করতে যেয়ে রূপালী দেখল, তাকে দেখে যোগীন খবরের কাগজে অপ্রতিভ ভাবে মুখ ঢাকল। সেবারে সে দেশে এসেছিল। অথচ এর আগে দেখা হ'লে বেণীতে টান দিয়ে রূপালীকে সে সরবে অভ্যর্থনা করত।

রূপালীর মনে কিন্তু কোনো বিকার হ'লো না। শ্লেটের পুরাণো লেখা তো মুছে যাবেই। শুধু বাড়ীর পথে ফিরতে ফিরতে সে একটু সবজান্তা সিনিকের হাসি হাসল। একজন ভদ্রব্যক্তি তখন তার জীবনে উজ্জ্বল ছায়াপাত করেছিলেন। তিনি সিনিসিজ্‌মে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরই আদর্শে রূপালী তখন সিনিক্ সাজবার ভান করত। মনে মনে সে ভাবত সত্য সত্যই সে একজন মহিলাসিনিক। কিন্তু এসব কথার আগে চল দার্জ্জিলিং যাই।

গোলাপের বনে যে মেয়েটি বিচরণ করছে, তার কপোল গোলাপী হয়েছে স্বাস্থ্যের দাক্ষিণ্যে! হাতের ছাতাটা দুলিয়ে

সে পাশে বাঘের-মত-ছাপ-দেওয়া গরমের কাপড়ের স্যুট-পরা কিশোরটিকে তাচ্ছিল্য জানালো—যাই বলো শেখর, যা গোলাপ ফুল দেখলাম লরি সাহেবের বাংলোতে, সারা দার্জ্জিলিং সহরে সে রকম হয় না। ভারি তো এ সব ফুল! ওঃ, ওই গোলাপ যদি পাওয়া যেতো!

খোকা-নামধারী ক্ষীণদেহী, ফর্শা একটি বালক উত্তর দিল শেখরের পরিবর্ত্তে—উঃ, কি লাল আর বড় বড়, না ভাই? কিন্তু ও পাওয়া যাবে না। যে রাক্ষুসে কুকুর পুষেছে সাহেব। একটা নানীকে মাস কয়েক আগে কামড়ে মেরে ফেলেছে, জানো? তার ওপর গুর্খা দারোয়ান। নিজে খুব বদ্‌মেজাজী কিনা সাহেব।

যে যার বাড়ীতে রওনা হ'ল সন্ধ্যার অন্ধকারে। এরা সব পাশাপাশি বাড়ীতে থাকে, এই ছেলেমেয়ের দল। এখানে এসে আলাপ হয়েছে।

পরের দিন ঘুমন্ত মেয়েটির বালিশের পার্শ্বে দেখা গেল একগুচ্ছ লাল, বড় গোলাপ, তখনো পাঁপড়ীতে শিশির লীন হয়ে আছে। তাদের বোঁটার সঙ্গে লাগান একটুকরো ছেঁড়া কাগজে কাঁচা হাতের লেখা—'তোমার জন্য এনেছি। শেখর।'

দার্জ্জিলিং ছাড়বার আগের দিন অপরাহ্ণ। ভিক্‌টোরিয়া প্রপাতের পাশে একটি ঝোপ—দুইটি কিশোর-কিশোরী।

তুমি কাল চলে যাচ্ছ। আমার জন্য মন খারাপ হ'বে না? শেখর কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

কেন হ'বে না? সকলের জন্যই হ'বে। দার্জ্জিলিংএর জন্যই হবে।— শাণিত, দ্বিধাহীন স্বরে উত্তর পাওয়া গেল।

আমি তোমাকে রোজ চিঠি লিখব। তোমার জন্য আমি কাঁদব। শেখরের চক্ষু সজল, সে হাত বাড়াল।

চকিতে মুখ ফিরিয়ে কি যেন তার মুখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে কিশোরী খুঁজে দেখল। কি দেখল সে জানি না। একঝটকায় হাত ছাড়িয়ে কঠিন কণ্ঠে সে মর্ম্মান্তিক তিরস্কার করল—তোমার বুঝি সবটাতেই কাঁদা অভ্যাস? ওসব আমি পছন্দ করি না। সেন্টিমেণ্টাল্!

মেয়েটি একছুটে উঁচুনীচু রাস্তা অতিক্রম করে তার বাড়ীতে ফিরে গেল; আর আবছা সন্ধ্যায় ঘন ঝোপের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে রইল শেখর। মেয়েটি রূপালী।

এই হৃদয়হীনতা রূপালীর জীবনে দেখা গেছে বহুবার। প্রণয়ীকে সে কামনা করত পরম যোগ্যরূপে, তার চেয়ে অনেক উর্দ্ধের আসনে। যেখানে দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষ ভাবপ্রবণতায় তাকে ধরা দিতে আসত, যেখানে পুরুষ দম্ভের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না, বিশ্বের চক্ষে যে পুরুষের ভালবাসার কোনও মূল্য ছিল না, সেখানে সে করেছে ঘৃণা, প্রত্যাখ্যান। চিরকাল সুন্দরের পূজা করে রূপালীর চিত্ত বিচরণ করত কল্প-লোকে। সতেজ ছিল তার মন, সবল ভালবাসার আদর্শ! Glamour ও মোহ যেখানে পারিপার্শ্বিক রচনা করত না, সেখানে তার চিত্ত হ'ত একান্ত বিমুখী। মাধুরীদিও তাই বেদী-চ্যুতা হয়েছিলেন আমরা জানি। সে চাইত সেমেলির চাওয়া—দেবশ্রেষ্ঠ জিউস্ তাকে বজ্র-অগ্নিতে দেখা দেবেন, দেবতার আসন থেকে দেবতা নেমে আসবেন তাকে ভালবাসতে।

তরল ভাবপ্রবণতার সাক্ষাতে রূপালীর আবার কেমন একটা গা ঘিন্-ঘিন্ করত, যেমন কেন্নোকে হেঁটে যেতে দেখলে হয়! কেমন একটা অস্বস্তি, জুগুপ্সার ভাব আসত তার মনে।

রতীন্দ্রের বেলায় এটা দেখা গেছে। তার নিজের মন ছিল বুদ্ধি-প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল।

দুর্ব্বল ভাবপ্রবণ লোক তুমি ঘৃণা কর রূপালী, কিন্তু তুমি নিজেই যে তাই। তোমার দুর্ব্বলতার প্রমাণ, রক্তগোলাপ দেখলে আজো, আজো তোমার শেখরের কথা মনে পড়ে, কত সহস্রদিনের ব্যবধান পার হয়ে।

পদ্মানদীর উপর ষ্টীমারে ফিরছে রূপালী কলিকাতায়। মধ্যে পাবনাতে মামার বাড়ী গিয়েছিল তারা, সতেরো বছর পরে এক মাসী করাচী থেকে প্রথম বাংলাদেশে পিতৃগৃহে এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিনদশেকের জন্য। মাসতুতো ভাই সুবলের বয়স বছর কুড়ি হ'বে করাচীতে অষ্টপ্রহর জাহাজীগোরাদের সঙ্গে মিশবার ফলে রুচি তার বিকৃত, বকাটে চেহারা। গৌরবর্ণ রোদে পুড়ে তামাটে, অসংখ্য চুরোটীকার ধূমেঃ অধরোষ্ঠ মলিন। রূপালীর কচি-কিশলয়-জনিত লাবণ্য তাকে আকৃষ্ট করল। আজন্মবিচ্ছেদে ভ্রাতৃসুলভ ভাব তার আসবার অবকাশ পায়নি। নিজের নানা কল্পিত অভিযানের গল্প সে করে যেত রূপালীর মুগ্ধ শ্রবণে। রেনল্ড্‌ এর বইএর অশ্লীল আখ্যায়িকা মুখে মুখে বলে বালিকার মন বুঝতে চেষ্টা করত। নির্ভরশীল, শিশুর মন রূপালীর, সমস্ত কথা সে বিশ্বাস করে সুবলদাকে অবাধে বীরের আসনে বসিয়ে মহিমামণ্ডিত রেখেছিল। আবার সুবলদার আচার-ব্যবহারে কি যেন একটা না-বলা অস্বস্তি তাকে পীড়া দিত, কি যেন অজানা আশঙ্কা তাকে ভীত করত। সে আশঙ্কা তার মনে শুধু ছায়াপাত করেছিল, কোনও বাস্তব রূপ ধরেনি। তার বিরুদ্ধে কি অস্ত্র ব্যবহার করতে হ'বে সে তা জানে না, বোঝে না। মনে হ'ত, ভাইবোন সম্পর্কটা সুবলের কাছে জোর দিয়ে

স্থাপন করতে পারলেই তার বিপন্মুক্তি হ'বে। মেয়েদের মন এই রকম, অনুভূতি অতি তীব্র হয়, বিশেষতঃ রূপালীর মত সুকুমার মনের। তারা আভাসে অপরপক্ষের মনোভাব বুঝতে পারে, ঈশ্বর তাদের সহজাত বুদ্ধি দিয়ে রক্ষা করেন। আত্মরক্ষা তাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম. সেটা তারা সহজে শেখে! যুগযুগান্তর ধরে পুরুষ আক্রমণ করেছে নারীকে জৈববাসনায়। অসভ্যযুগের প্রারম্ভ হ'তে এ সভ্যতার প্রখর দিবালোকেও সে প্রচেষ্টার বিলুপ্তি হয় নি। গোপনে হয়ত সে আছে, কিন্তু সে আছেই।

বার্নাড্ শ 'ম্যান অ্যাণ্ড্ সুপার্ম্যানে' যা খুসী বলুন না কেন, আদিম প্রবৃত্তি নরের নারীর দেহকে জোর করে উপভোগ করা। প্রতি পূর্ণিমায় যে পৈশাচিকতা সম্পাদিত হ'ত আদিযুগে, আজও তার চিহ্ন রয়ে গেছে নারীশরীরে।

বিশেষ কিছু হ'ল না কিন্তু। লুব্ধ দৃষ্টি সুবলের রূপালীকে অনুসরণ ক'রে ক'রেই ক্ষান্ত হ'ল। ছোট বাঁধান উঠোনে রূপালী ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, দাওয়ায় মোড়ার উপর সিগারেট মুখে তার গমনশীল দেহের সঙ্গে সঙ্গে সুবল নিজের দৃষ্টিকেও ফেরাচ্ছে। সে দৃষ্টি আর যাই থাক ভ্রাতৃস্নেহ ছিল না! প্রথম সেদিন রূপালীর পরিচয় হ'ল পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে।

ডেকে দাঁড়িয়ে চায়ের পাত্রে চুমুক দিতে দিতে রূপালীর মামা অমরেশ দিদিকে বললে—সুবলটা একেবারে বখে গেছে। যেমন চালিয়াৎ, তেমনি মিথ্যাবাদী। ছোটদির কপাল!

কোথাও আলগা পয়সা রাখার উপায় নেই, তক্ষুনি নিয়ে খরচ করে ফেলবে, না বলে-কয়ে। সুনীতি ছেলের শিক্ষার দিকে একটুও চোখ দেয়নি। যার তার সঙ্গে মিশে ছেলে যে বয়ে

গেছে ছাই। ফরাশডাঙার কালোপাড় শাড়ীর আঁচল মাথায় টেনে মা উত্তর দিলেন।

সোৎসাহে রূপালীর ছোট ভাই রূপেন বলে চলল, জানো মামা, সুবলদা কি মিথ্যাবাদী? বলে কি না তামার পয়সা বেঁকাতে পারে। দিদির কাছেও বলেছে, দিদি বিশ্বাস করেছে। নন্দকাকা বৈঠকখানায় যখন পয়সা হাতে দিল, কিছুতেই পারলে না। নন্দকাকা বললে 'চালিয়াৎ চন্দর'।

রূপালীর চিত্ত সচকিত হ'ল। সুবলদাকে সে উচ্চাসনে স্থান দিয়ে রেখেছে, লোকটার কথাবার্ত্তা মাঝে মাঝে বাঁকা মোড় নিলেও সাহস ও বীর্য্য আছে। 'চালিয়াৎ চন্দর', 'বকাটে', 'মিথ্যাবাদী', 'বয়ে গেছে'—ছিঃ ছিঃ! দ্রুত প্রতিক্রিয়া হ'ল রূপালীর মনে।

পরক্ষণেই এল ক্রোধ। হাস্যস্পদ হয়েছে সে অযোগ্যকে বড় ভেবে! আচ্ছা! এর পরে দেখা হ'লে দেখা যাবে।

সত্যই রূপালী দেখিয়ে দিয়েছিল। নিজের মাসতুতো বড় ভাইএর প্রতি অত তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ্যে দেখাবার জন্য আমি কতদিন মৃদু অনুযোগ করেছি।

আজ জানি তার খাতার পাতা উলটিয়ে যেতে যেতে রূপালীর আমাকে মনে পড়ছে! আমি যে তার জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ ভাবে জড়িত।

তারপরে রূপালীর জীবনে এল প্রথম প্রেম অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে। নারীর প্রথম ভালবাসা জ্ঞাতসারে। সে প্রেম কি অসহ সুখ নিয়ে এক বছর ছিল তার জীবনে! দেহ তার হয়েছিল সুন্দর মন তার আবেশ-নিবিড়। এখনো সে দিনগুলি চন্দন-প্রলেপের স্নিগ্ধতায় অনিমেষে জেগে থাকে।

পুরীর বালুবেলায় প্রথম দেখা। তখনো অপরিচয়ের কুহেলী। কেউ কারো কাছে অসামান্য হয়ে ওঠেনি। কোথাকার যেন রাজাদের বাড়ী ছিল বীচের ওপরে। তাঁদের সহগামী ছিলেন ভদ্রলোক। তরুণ যুবক, দীর্ঘ শাণিত তরবারীর ঔজ্জ্বল্য দেহে। সুন্দর চেহারা বলে রূপালী একবার তাকিয়ে দেখেছিল মাত্র।

সাহিত্য সভা। রূপালীর পিছনের আসন থেকে উঠে ভদ্রলোক আবৃত্তি করলেন—

"পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ?"

সামনে কতগুলি সুরূপা ও সুসজ্জিতা তরুণী বসে ছিলেন, তুমুল করতালিতে তাঁরা প্রশংসা জ্ঞাপন করেছিলেন।

সেদিন মনে হয়েছিল রূপালীর, এ করতালি পুরুষের রূপ ও যৌবনকে, কৃতিত্বকে নয়। তাই সে করতালিতে যোগ দেয়নি। বিরক্ত বোধ করেছিল সে! আগে একটি মহিলা গান গেয়েছিলেন, তখন এই তরুণীকুল বিদ্রূপের হাস্য করেছিল। আর এখন রূপবান যুবকের ক্ষেত্রে বিরাগ সহসা অনুরাগে পরিবর্ত্তিত হ'ল। তা নইলে অত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবার মত ভাল কিছু হয় নি।

আরো দু'একবার সমুদ্রসিকতায় দেখা হয়েছে। ভদ্রলোক তেমন মনোযোগ ব্যয় করেন নি!

পুরীর গাড়ীতে ফিরবার পথে অবশেষে আলাপ হ'ল। ভদ্রলোক রাজবাড়ীর বোনপো, কলিকাতা ফিরে যাচ্ছেন। রূপালীর বাবার তখন ব্যবসায়ীমহলে কিঞ্চিৎ নাম হয়েছিল। পরিচয় হ'ল। রূপালীরাও ছেলেদের গাড়ীতে ফিরছিল। লোকজন অত্যন্ত কম। দুই-একটি বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা ও বৃদ্ধ ভদ্রব্যক্তি ও অন্য একটি যুবক মাত্র সে গাড়ীতে ছিলেন।

ভদ্রলোকের নাম অসীম, সুন্দর চেহারার মতই সুন্দর ব্যবহার। এক মুহূর্ত্তে নিজের লোকের মত অসীম রূপালীদের দলে মিশে গেল। ঘনঘন তাদের সুযোগ সুবিধার খবর নিয়ে, ষ্টেশনে রূপালীর মাকে পান জুগিয়ে, বাবাকে চা খাইয়ে অসীম প্রীতিভাজন হ'ল।

কী সৌখীন, সুন্দর যুবকটী! দামী, বাদামী—কালো ডোরা-টানা র‍্যাগ পাতা—হাতে ইংরাজি নভেল। ছোট সুটকেশের ওপরে রাখা হোল্ড অল্। আর—তাদের বাক্স-প্যাঁটরা, ঘটীবাটী যতসব হিজিবিজি বাজে জিনিষ। সামান্য কয়েকটি আলুবেগুন সংসারযাত্রা থেকে উদ্বৃত্ত হয়েছিল, সে কয়েকটির মায়া পর্য্যন্ত তার মা ছাড়াতে পারেন নি; ঘটা করে পোঁটলায় বেঁধে কলিকাতায় নিয়ে যাচ্ছেন। একটা ঝাঁকুনি লেগে সমস্ত গড়িয়ে রেলগাড়ীর মেজেতে ছড়িয়ে পড়ল। সূক্ষ্মাগ্র চম্পক অঙ্গুলি নেড়ে অসীম সেগুলো তুলে দিল। লজ্জায় রূপালীর ধরণীকে দ্বিধা হ'তে অনুরোধ করতে ইচ্ছা হ'ল!

নিজের দিকে মনে মনে তাকাল সে। কট্‌কটে লালরংয়ের শাড়ী ধূলিমলিন, বাতাসে চুল রুক্ষ, মুখচোখ বিশুষ্ক,—শ্রীহীন। বয়স তার ষোড়শ মাত্র, দেহ অপরিণত। একটি বালকের মত দ্বিধাশূন্য, চপল তার চলাফেরা। আর উল্টোদিকে জানালা দিয়ে মুখ বাহির করে বসে আছে অসীম, পূর্ণবয়স্ক তরুণ। কড়া ইস্ত্রির সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী; সবল, শুভ্র গ্রীবা বেষ্টন করেছে বাঁকাগলা জামার। ডান হাত জানালার ওপরে অলস-ভঙ্গিতে রক্ষিত, দীর্ঘ অঙ্গুলিতে গোমেধ বসানো আংটী রৌদ্র লেগে জ্বলে উঠছে। প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ, দৃঢ় জানু, সব কিছুতেই সে যেন বিশাল একটা কিছু, রূপালী তুচ্ছাদপি তুচ্ছ তার কাছে। জীবনে প্রথম রূপালীর মনে হ'ল, কেন সে সুন্দর হ'ল না, কেন

তার যৌবন এখনও আসে নি। এই সৌন্দর্য্য-দেবতা,—এই পরিণত পুরুষ কখনো কি তার দিকে ফিরে চেয়ে দেখবে? কিছুই যে তার নেই! কয়েকদিন মাত্র আগে সাহিত্য-সভায় যাকে রূপালী গ্রাহ্য করে নি, আজ তারই মনোহরণের জন্য সে ব্যাকুল হয়ে গেল। কেবলি তার মনে গুঞ্জরণ তুলতে লাগল গানের মত অবিরাম একটা সুর—আমার কি আছে? আমার কি আছে? উনি আমার মধ্যে কি দেখবেন?

আমি জানি অসীম কি দেখেছিল, কারণ দর্শক তখন রূপালীর জীবনে আমিও ছিলাম। সে দেখেছিল কোমল ফুলের মত সুন্দর, নিষ্পাপ মুখ; সে মুখে এখনও কুটিলতা, বাসনা ছায়াপাত করে নি। সে দেখেছিল মনের উন্নতভাবের বিকাশ সে মুখে, কবি-চিত্তের সুকুমার লীলাখেলা। সে দেখেছিল পদ্মপলাশ নেত্রে অবাধ সারল্য, তনুদেহের চঞ্চল শ্রী।

অন্য প্রান্তে শ্যামবর্ণ যুবকটি যে একাগ্রদৃষ্টিতে রূপালীকে লক্ষ্য করেছেন, তাঁর দিকে রূপালীর মন ছিল না। জানালাটা রূপালী খুলতে পারছিল না। তিনি এগিয়ে এসে খুলে দিলেন কিন্তু ভাঙ্গা কাঁচ লেগে হাত অনেকটা কেটে গেল। রক্ত মিশল গাড়ীর মেজের জমাট ধূলোর ওপর। হাসিমুখে ভদ্রলোক চামড়ার হাতবাক্স খুলে আইওডিন ব'ার করলেন।

শ্যামবর্ণ তাঁর, খাকী পোষাক পরা, রেলে চাকুরী করেন, কলিকাতা থাকেন! তাঁর রক্তপাতের মূল্য রূপালী দিল না, দিল অসীমের সামান্য ভদ্রতার কথার মূল্য—ওখানে তোমার রোদ লাগছে না তো?

হায় রূপালী, চিরকাল তুমি ব্যাকুল হয়েছ বাহিরের চাকচিক্যের উদ্দেশ্য!

কলিকাতা আসবার কয়েকটি ষ্টেশন আগে অসীম নেমে পায়চারী করছিল। গাড়ীর মধ্য থেকে তার দিকে চেয়ে সহসা রূপালীর মনে আকুলতা জাগল। কিসের যেন ব্যথা, একটা হতাশা। যেন একটা নিদারুণ ক্ষতি তার হয়ে গেছে। এখনি এসে যাবে তাদের গম্যস্থান, জনারণ্যে অসীম হারিয়ে যাবে। আর দেখা হবে না। পথিকবন্ধু সে, জীবনে সে হবে পলাতক। অপরাহ্ণের আকাশে উড়ন্ত, লঘু মেঘ-খণ্ডের দিকে চেয়ে রূপালীর কেমন যেন অস্থিরতা বোধ হ'ল, সহসা চোখের পাতা থেকে একবিন্দু জল হাতের 'গঙ্গা-যমুনা' বালার ওপর গড়িয়ে পড়ল।

সে কাঁদছে, কাঁদছে সে! আশ্চর্য্য! সবিস্ময়ে রূপালী হাতের অশ্রুবিন্দু চেয়ে দেখল। বিনা কারণে, বিনা ব্যথায় কেমন করে তার চোখে জল এল? যে রূপালী তার সহস্র বাল্যসঙ্গীকে ফেলে আসতে কিছু ক্ষুণ্ণ হয়নি, সামান্য পথের সাথীর জন্য তার এই অশ্রু। হাসি পায়।

সেই নিরালা অপরাহ্ণে, মধ্যম শ্রেণীর গাড়িতে বসে, বি-এন-আর রেলওয়ে লাইনে এক মুহূর্ত্তে চপলা বালিকা তরুণীতে রূপান্তরিত হ'ল একটি অশ্রুবিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে।

আজকের রূপালী হাসছে। সাদা চতুষ্কোণ কাঁচের ঢাকনী পরান টেবল্ ল্যাম্প থেকে আলো পড়েছে তার হাস্যরত মুখে। তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ জানি। আর একটু এগিয়ে এস, ভাল করে দেখ। সামনের চারটে বাঁধানো পাথরের দাঁতের ওপর আলো পড়ছে। কানের পাশে ঈষৎ শুভ্র চুলের থাকে সেই আলো। শিথিল, ধমনি-চিহ্নিত হাতের পাতায় সেদিনের রূপালীর অশ্রুর ইতিহাস উল্টে দেখে আজকের রূপালী হাসছে।

রূপালীর ডাইরি

'আজ ফিরেছি পুরী থেকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে আমার ছোট ঘরে, আমার মনে। .যার উদ্দেশে কবিতাটি রচনা করলাম সে চিরদিন থাকবে আমার স্মরণ-পথে।

পথিকবন্ধু

বিজন জীবনে মম এলে তুমি, এলে তুমি প্রিয়,
একেলা চলার পথ হ'ল তাই বড় রমণীয়।
রহিলে না একপল, চাহিলে না একবার ফিরে,
চলে গেলে উদাসীন দূর কোন্ পথপ্রান্ত ধরে ?

হে পথিকবন্ধু মম, চলে যদি যাবে জানো মনে,
কেন তুমি দেখা দিলে অনাহূত আমার জীবনে ?'

(অত কম বয়সেও রূপালীর কোন লেখায় পদান্ত মিলের ভুল দেখিনি। হয়ত মানসিক বিক্ষোভ এর কারণ এই কবিতায়)।

নীলাভ কাগজগুলি রূপালী রূপার ভারী কাগজকাটা ছুরি দিয়ে চাপা দিল। এ অধ্যায়ে তার ইতিহাস দেখবার প্রয়োজন নেই। মনে আছে এমনি। এ যে তার প্রথম প্রেম।

অসীম এল রূপালীদের বাড়ীতে আলাপের সূত্র ধরে ক্রমাগত। রূপালী তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি তার মত দীনহীন, সাধারণ মেয়ের জন্য দেবতার মত সুন্দর, সর্ব্বগুণাধার কোন তরুণ বিচলিত হবে। সকলের সঙ্গে আলাপ করে যেত অসীম, রূপালী থাকত সে ভিড়ের মধ্যে। তার ওপর কোন পক্ষপাত দেখায় নি অসীম প্রকাশ্যে। আড়ালে কথাবার্ত্তার মোড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে রূপালী নির্ব্বোধ। তাকে যে অসীমের

মত কোন ব্যক্তি কামনা করতে পারে, সে ধারণা ছিল রূপালীর স্বপ্নের বাইরে। তাই এ বিষয়ে সে ভেবেও দেখেনি।

অসীমের বয়স তখন রূপালীর প্রায় দ্বিগুণ ছিল। বড় বংশের ছেলে হলেও ঈশ্বর তাকে অকারণ রূপদান করে ক্ষান্ত হয়েছিলেন ঐশ্বর্য্য দেননি। দারিদ্র্যের মধ্যে তার বেশী লেখাপড়া সম্ভব হয়নি, চাকুরীও ভাল মেলেনি, তবে বড় বড় ঘরের সঙ্গে অজস্র মেলামেশার ফলে তার দেহমনে একটা উচ্চ পালিশ পড়েছিল, যা দেখামাত্র রূপালী মোহিত হ'ল। বাংলার এক প্রাচীন উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম জমিদার বংশের শোণিত তার শিরায় প্রবাহিত হলেও ষোড়শবর্ষ জীবনে নাগরিক বড় ঘরের ছেলে সে বিশেষ দেখেনি। তার জগতে অসীমের ন্যায় পুরুষ একান্ত দুর্লভ ছিল।

সে কি ভালবাসা! সকালে চোখ মেলে কার কথা তার মনে ভেসে আসত? কার সহাস্য মুখচ্ছবি তার নিদ্রাকাতর নেত্রের আগে প্রহরা দিত? কার সঙ্গে অজস্র কথাবার্ত্তায় সে মগ্ন থাকত কল্পনায়? কার মনের ছায়া সদ্যজাগ্রত কিশোর চিত্ত প্রতিফলিত করে নিয়েছিল?

মাথার ওপরে টাঙানো অয়েল পেন্টিং, নৃত্যপরা উর্ব্বশী। চিত্রের দিকে তাকাল রূপালী। সুরসুন্দরী, তোমার মত্ত, বাসনা সহস্র প্রেমের মধ্যে কখন কি তুমি আমার মত সর্ব্বহারা, উন্মাদ-প্রেম অনুভব করেছ? কোন এক বিশেষ পুরুষের স্মৃতি কি তোমার অধরে অমন মদালস, ললিত হাস্য এনেছে? সে কি পুরূরবা না অর্জ্জুন?

এদিকে চিত্র বত্তেচেলির 'ভীনাসের জন্ম'। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের বক্ষে নগ্নতনু গ্রীক্‌দেবী। প্রেম তাঁর লীলাখেলা,

উর্ম্মির মত ক্ষণভঙ্গুর। যখন আসে অন্ধ আবেগে গ্রাস করতে অগ্রসর হয়, কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াসে ফেনপুঞ্জে পায়ে লুণ্ঠিত হয়। তুলোর পাঁজের মত ফেন অবশিষ্ট থাকে। তারপর তাও চলে যায়, বালুর স্তূপে হয়ত তরঙ্গাঘাতের চিহ্ন থাকে কিছু! তাও বেশীক্ষণ নয়।

হে সাগরউত্থিতা আফ্রোদিতি, প্রেম তুমি বুঝেছিলে। প্রেম ক্ষণস্থায়ী, জীবনে তাকে ধরে রাখবার প্রচেষ্টা বিফল। অনাদি-যুগ থেকে কত অ্যাড্যাম কত ইভ, প্রেমকে বন্ধনে আনতে চেয়েছে। কত যৌবনের মণিদীপে কত প্রেমের আরাধনা হয়েছে। আজো, সন্ধানী মানবমন, তোমার যাত্রা শেষ হ'ল না। আজও তোমার চির-অভিসারী হৃদয় প্রেমের শেষকথা জানতে পারল না।

আফ্রোদিতি, তোমার চক্ষে পলক পড়ে না, অধরের লাস্য-হাস্য কখনও তোমার মলিন হয় না। তুমি সাধারণ অনুভূতির অতীত, তুমি অমরী। কিন্তু হে প্রেমের দেবী প্রেম কি, তা তুমিও কি বুঝেছিলে?

ঘাড়তে আধঘণ্টা বেজে গেল। সময় নেই। কিছুরই সময় নেই। মৃত্যু আসছে—মৃত্যু। মৃত্যু কি শুধু জীবনের? মৃত্যু প্রেমের, মৃত্যু হৃদয়ের। যুগান্তসঞ্চিত তমিস্রা ভেদ করে শোনা যাচ্ছে শত শত মানবাত্মার বিলাপ—

"তদ্বৎ জীবনমতিশয় চপলম্"

"Retro me, Sathana."

"Dust unto dust."

"কালস্রোতে ভেসে যায় জীবনযৌবন ধনমান" ইত্যাদি।

নীরব রজনীতে সে আর্ত্তনাদ বিভীষিকার মত দূর চক্রবাল-

রেখার সীমান্তদেশ থেকে উঠে আসছে সুপ্ত মানুষের কানে 'বল হরি হরি বল', 'রামনাম সত্ হ্যায়' রূপে।

আমার কি ভয়? আমার তো মৃত্যু হয়ে গেছেই রূপালী ভাবল।

এতদিনে, রূপালী, তোমার একটা সত্য উপলব্ধি হ'ল।

আমার কাজ হ'ল তারপরে,—এবারে একটু আমার কথা শোন—রূপালী ও অসীমের কথাবার্ত্তা রূপালীর মুখে শোনা, শোনা অসীমের অনন্ত প্রশংসা। আমার কর্ত্তব্য হ'ল অসীম রূপালীকে যে সব কথা বলেছে, তার টীকা করে করে শ্রীমতীর মনের মত ব্যাখ্যা প্রস্তুত করা। আঃ, কত যন্ত্রণাদায়ক দিবস আমার কেটেছে এইভাবে!

রেলিংএ পাশে আমার সেদিন রূপালী দাঁড়িয়েছিল। জড়ি-পাড় নীলাম্বর পরেছে রূপালী, বেণীতে জড়ান তার আধফোটা বেলকুঁড়ির মালা। সেদিন ছিল তার সপ্তদশ জন্মতিথি। ইদানীং কিছু কিছু প্রসাধন-চাতুর্য্য সে শিখেছে।

নীচে রান্নাঘরে রূপালীর মা মাংসের পোলাউ নির্ম্মাণকার্য্যে রত। তারই বাদামপেস্তা ছাড়িয়ে দিয়ে রূপালী উঠে এল। মেয়ের কবি-কবি ভাব দেখে শঙ্কিত হয়ে মা আজকাল তাকে কিছু কিছু সংসারের কাজকর্ম্মে লাগাতে চেষ্টা করতেন।

একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সংস্কৃতি সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করলাম। জানি, এই তারাখচিত আকাশের তলায়, টবের গন্ধরাজের গন্ধে অসীমের কথা আমার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য রূপালী উৎসুক। লজ্জায় অসীমকে নিমন্ত্রণ করবার কথা সে মাকে বলতে পারেনি। কিন্তু আজ তার মন গোপনে

যার পিছনে ফিরছে সে নিমন্ত্রিতদের কেউ নয়, সে দূরে শ্যামপুকুর লেনে থাকে।

সংস্কৃতি মানে রূপালীর কাছে অসীম। তাই আলোচনাটা সোজাসুজি অসীমের বিষয়ে তুলতে হ'ল না। রূপালী, তুমি এখনও জানন৷ আমি তোমাকে খোলা বইএর সহজতায় পড়তে পারতাম। তুমি ভাবতে আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারি নি, তোমার মত অর্দ্ধ-শিক্ষিত, অপরিণত শিশুর সঙ্গে সংস্কৃতির আলোচনা সত্যই আমার ঈপ্সিত ছিল।

আমি—আজকে তোমার জন্মদিন, রূপালী। মনে রেখো বাইরে শিক্ষা বা উন্নতি করে গেলে চলবে না। অন্তরের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। তোমার কি মনে হয় না এটাই সবচেয়ে বড় ?

রূপালী—নিশ্চয়, নিশ্চয়! তুমি তো জান আমি সকলের ওপরে কাল্‌চার্‌কে বড় বলে মানি। বিদ্যার যতই গৌরব থাক কাল্‌চার না থাকলে তার দাম নেই। সেই রবীন্দ্রনাথ যে 'শেষের কবিতায়' বলেছেন—কমলহীরের আংটির পাথরটা হচ্ছে বিদ্যা, আর তার থেকে যে দীপ্তি ঠিকরে পড়ে সেটা হচ্ছে কালচার্‌। কিন্তু প্রকৃত কাল্‌চার দেখা যায় না। কত বড় লোক, কত শিক্ষিত দেখলাম, ঠিক কাল্‌চার কারুরই নেই।

আমি—সত্যি, এই বাড়ীতে কত লোক আসে। প্রকৃত শিক্ষা দেখেছ, প্রায় কারুরই নেই।

রূপালী—তা ঠিক।

তুমি প্রতিবাদ করনি তৎক্ষণাৎ। তোমার হয়েছিল রাধার অবস্থা। কত ছলকলা আশ্রয় করতে হ'ত! তোমার চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে মনে পড়ে গেল আমার—

"তাহে পুন মোতিহার টুটি ফেলল,
কহত—হার টুটি গেল।"

আমি—এই যে প্রফেসর অজিতবাবুকে দেখ। ফার্স্ট-ক্লাশ-ফার্স্ট অথচ···

রূপালী—যা বলেছ। সেদিন খাবার আসনে বসে থেকেই দেশলাইয়ের কাঠি বের করে সবার সামনে হাঁ করে দাঁত খোঁচাতে লাগলেন।

আমি—আর উকীল শিবপ্রাসাদ লাহিড়ী?

রূপালী—ছি, ছি। সেদিন উনি আমাকে বলছেন 'যে বইতে যুবক-যুবতী আর লভ্ আছে, সে বই তো তোমার ভাল লাগবেই।'

আমি—তাহ'লে কিন্তু, যা'ই বল তোমাদের বাড়ীতে প্রকৃত সংস্কৃতি-সম্পন্ন লোক কেউ আসে না।

রূপালী—তাইত দেখছি। কিন্তু—একজনের কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ যে?

সহসা কিছু মনে করবার ভান ক'রে রূপালী কথা বলল।

আমি—কে বল ত? আমার ত মনে হচ্ছে না।

তোমার সঙ্গে অহরহ থেকে থেকে আমি অভিনয়দক্ষ হয়েছিলাম, রূপালী। উপায়ন্তর ছিল না।

রূপালী—কেন, অসীমবাবু?

আমি—ঠিক, ঠিক। অল্পদিন আলাপ কিনা তাই আমার মনে পড়ছিল না। কি আশ্চর্য্য শিক্ষা ভদ্রলোকের। সেদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তোমার জ্যাঠামশায় আছাড় খেয়ে একেবারে নীচে গড়িয়ে পড়লেন। মোটা লোকের ছেলেমানুষের মত ওভাবে পড়া দেখে আমরা কেউ হাসি চাপতে পারি নি। কিন্তু, তোমাদের অসীমবাবুর মুখের একটি রেখাও বদলে গেল না। যেন কিছুই হয়নি এমনি স্বাভাবিক স্বরে বললেন, 'এখানে জল ফেললে কে?'

রূপালী নিরুত্তর।

আমি—কি চমৎকার রুচিসঙ্গত বেশভূষা দেখেছ? অবশ্য অত সুন্দর চেহারায় যা পরতেন তাই মানাতো। কথাবার্ত্তা কি সরস? আর এত মার্জ্জিত ব্যবহার! কাল্‌চার জিনিষটা ওঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে।

রূপালী—দেখেছ কথাবার্ত্তার ধরণ কি সুন্দর? সেদিন আমাকে কথায় কথায় বললেন যে—'আমাদের মনের স্বপ্ন পাখীর মত উড়তে চায়। সে পাখীর রং নীল—অজানা রহস্যে তার পালক গাঢ় সুনীল। সে স্বপ্নের সাথী।' কি কল্পনার জোর, আর কি কবিত্বপূর্ণ ধারণা! আমার মনে হয় উনি নিশ্চয় ছদ্মনামে কোথাও লেখেন।

আমি—তা বিচিত্র কি। (মনে মনে) মেটার্‌লিঙ্কের 'ব্লু-বার্ড' যে তুমি পড়নি, তাই।

রূপালী—আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না উনি বড়দরের কেউ? অত ছোট চাকরী উনি করেন না, নিশ্চয় আমাদের কাছে মিথ্যা করে বলেছেন?

আমি—মিথ্যা ব'লে লাভ কি?

রূপালী—বা'রে, মজা করবার জন্য। দেখ না ওঁর sense of humour কি strong?

আমি—তা হ'বে।

বিদ্যা বা বুদ্ধি মেয়েদের থাকলেও মোহ চলে যায় না, বিশেষতঃ প্রথম প্রেমের ক্ষেত্র। ভেবেছিলে, পরে তুমি মোহ-মুক্ত হতে পেরেছ, প্রেমাস্পদকে অত্যুজ্জ্বল বর্ণমণ্ডিত তুমি করনি। করেছিলে, করেছিলে। একটি পুরুষকে চিরদিনের জন্য আঁকড়ে রাখবার নির্বুদ্ধিতা তোমার হয় নি। প্রেমকে তুমি গ্রহণ করেছিলে তার নামমূল্যে, ভবিষ্যতের সঞ্চয়ে তোমার লোভ ছিল

না। তাই বলেছি—'সাধারণ ভাবপ্রবণতা তাকে স্পর্শও করে না।' পাত্রের ওপর তোমার মনোযোগ ছিল না, ছিল প্রেমের ওপর। তুমি সারাজীবন ধরে প্রেমে পড়েছ প্রেমেরই, কোন পুরুষের নয়। তাই প্রেম তোমাকে প্রতারণা করল। প্রেমকে তুমি বুঝতে চেয়েছ বই-পড়া বিদ্যা দিয়ে। তার হাতে আত্মসমর্পণ করনি, যা তোমার দেশের অন্য দশটা মেয়ে করে এবং পরিণামে সুখী হয়। কিন্তু তীক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি বা বিশ্লেষণ-শক্তি থাকলেও মোহ তোমাকেও গ্রাস করেছিল, তার কারণ তুমি অসাধারণ হ'লেও নারী।

কী স্বপ্ন দিয়ে গড়া তোমার রাজপুত্র! তাকে ঘিরে ঘিরে কী মোহের পরিমণ্ডল রচনা! নব প্রেমের কাছে প্রত্যেকবার সমস্ত প্রাক্তন প্রেম তুচ্ছ হয়ে যাওয়া! মোহ একটি দুর্ব্বল মনোবৃত্তি হ'লেও তার শক্তি অপরিসীম। কিন্তু, পরে আবার যখন জীবনে প্রথম প্রণয়ী ফিরে এল, তখন তাকে ঘৃণা করলে কেন? মোহ-মুক্তি, না প্রতিক্রিয়া?

আসলে তোমার মন অদ্ভুত রূপালী। এক প্রেমের মৃত্যু পর্য্যন্ত শেষের দিকে দেখতাম তোমার প্রতীক্ষা সহ্য হ'ত না! তার জীবদ্দশায় নূতন প্রেমের আরতি হ'ত, ঝাপসা হয়ে যেত প্রাচীন প্রেম, মিলিয়ে যেত। পঁচিশ বছরের রূপালীর মনের চাঞ্চল্য সপ্তদশের রূপালীর কল্পনাতীত ছিল।

তুমি গুন্‌গুন্ করে গান ধরেছিলে—

"তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা।"

নীচ থেকে তোমার মাতার কণ্ঠ ভেসে এসেছিল, ও রূলি,

আবার কোথায় গেলি? ঠাকুরের হাত বন্ধ, পুলিগুলো গড়ে দিয়ে যা না। এখনি তোর মামারা যে এসে পড়বে।

তুমি নীচে নেমে গেলে।

রূপালী ভাবছে আলোর নীচে।

সেদিন সপ্তদশের রূপালী কেন অত পুলকিত হয়েছিল? তার প্রিয় তার কাছে আসেনি, তবু সে যে আছে এই অনুভূতি তার সমস্ত দিনযাত্রাকে পরম আনন্দ জুগিয়েছিল। সে আছে, কোথাও আছে। আমি তাকে জেনেছি, আমি তাকে চিনি—এইতো মৃগনাভি আমাকে সুরভিত করে রেখেছে। সেদিনের তারিখে রূপালীর খাতায় কিছু লেখা নেই, কেবল বায়রনের একটি পংক্তি তোলা রয়েছে—

"The utmost share of my joy should be
Only to kiss the air that lately kissed thee."

ধন্য প্লেটোর দুহিতা! মধ্যে যে যৌনজীবন সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, প্রথম প্রেমের অপরূপ সৌন্দর্য্যে তার বিলুপ্তি হ'ল। রূপালীর জগতে রূপ ও রস মোহন স্বপ্ন রচনা করে দিল। কেবল কাছে বসে কথা বলা ও কথা শোনা ভিন্ন কোন তৃপ্তি তার চাহিদা হ'ল না। সর্ব্বদা একটা সমাহিত ভাবে সকলের মধ্যে সে ফিরতে লাগল। বাইরে কথা বলে যাচ্ছে সে সকলের সঙ্গে, কিন্তু মন তার মনে মনে কথা বলে যাচ্ছে একজনের কথার উত্তরে। সমস্ত কিছু সে দেখছে অন্যমনাভাবে যেন 'ব্রাহ্মণের ছাঁদার' মত সব তার পৌঁছে দিতে হ'বে কোন গৃহে। তাকে বলেছে অসীম—সে অসামান্যা, কবিতায় তার মত হাত এত অল্প বয়সে অসীম দেখেনি। তাই সর্ব্বদাই সে অসামান্যতা

রক্ষা করবার প্রচেষ্টা রূপালীর নিরন্তর চলত। তার ফলে নানা বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ সে পড়ে ফেলল অসীমের সঙ্গে আলোচনা করবে বলে। কলাবিদ্যার চর্চ্চা করতে লাগল অসীমকে চমৎকৃত করে দেবে বলে। কথায় তার এল শালীনতা, ব্যবহারে মার্জ্জন। এই তার নিজের কাল্‌চারের সূত্রপাত।

এ কাহিনীতে রূপালীর বহির্জীবনের কথা বিশেষ কিছু বলা হচ্ছে না। পড়াশোনায় ভাল নাম নিয়ে একের পর এক পরীক্ষায় পাস করতে লাগল রূপালী। অন্যান্য বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করে সে গুণী বলে পরিচিত হ'ল। পরিচিত ও বন্ধুমহলে তার কবিখ্যাতি রটে গেল। কিন্তু এসব দিয়ে প্রয়োজন নেই। লেখাপড়ায় তার থেকে ভাল ফল করেছে এমন মেয়ে সহস্র দেখা যাবে। গান তার থেকে ভাল গাইতে পারে প্রায় আজকালকার সকল তরুণী। কবিতা আজকাল অনেকে তার চেয়ে ভাল লেখে। কিন্তু কয়জনা তার মত প্রেম করেছে?

চোখে চপল অর্থব্যঞ্জক দীপ্তি, অধরে সুকুমার সহাস্য কোমলতা। গণ্ডে লালিমা, গমনে যৌবনের উদ্ধত ব্যঞ্জনা। আর তার দেহ? কি সুন্দর সে শরীর হ'ল প্রেমের স্পর্শে!

উন্নত বক্ষ, স্পর্শলালসা সেখানে সুপ্ত। ক্ষীণ কটির উপর শাড়ীর পাড়টি। বাহু হস্তি-শুণ্ডের মত ক্রমক্ষীণায়মান, দৃঢ়। গাত্রবর্ণ নিষ্কলুষ মর্ম্মর যেন। কালো চুলে রেশমের উজ্জ্বলতা।

কী বাসনা জেগে উঠত তার পদক্ষেপে! সুন্দর সে ছিল না, কিন্তু কী বর্ণ বৈচিত্র্য! কী উজ্জ্বল রংয়ের সমবায়ে আঁকা এই রূপালী! রক্ত, শুভ্র কৃষ্ণ—প্রধানতঃ এই তিনটি বর্ণ নির্ব্বাচিত হয়েছিল। রূপার তার দেহ, প্রবালের কপোল ও অধর, ইন্দ্রমণি তার চোখে, চুলে।

দেখেছি কেমন করে রূপালীকে পুরুষের দৃষ্টি অনুসরণ

করত। বুঝেছি তাদের মনোভাব। দেহের প্রাচুর্য্য তারা উপভোগ করতে চাইতো সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। তার ছোট-হাতের জামা-পরা শুভ্র বাহু চাই কণ্ঠে। নির্ম্মম অধরে চাই তার ক্ষীণ রক্ত অধর অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংলগ্ন। সবল বাহুতে মর্দ্দন করতে চাই তার ললিত তনু। তবে না ভালবাসা !

বাসনা রূপালীকে স্পর্শ করেনি সে সময়ে, শুধু সে তার মনের দাবী মিটিয়ে যাচ্ছিল ! পুরুষের সামনে কুণ্ঠা ঘোচেনি তখনও তার। দূরে দূরে থাকত সে। আর তখন তার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছিল অসীমের প্রতি তার আদর্শবাদী, একান্ত সতী-চিত্ত প্রেম।

কোণে তেপায়ায় রাখা কিউপিড্ ও সাইকীর মর্ম্মর মূর্ত্তির কাছে উঠে গেল রূপালী। গভীর রাত্রি, নিকষকালো তার আরবণ। কাকজ্যোৎস্না বুঝি একটু দেখা যাচ্ছে।

মানুষ চলেছে কালের মত একই দিকে জৈব বাসনায়। যুগ যুগ ধরে যৌবন এই এক বস্তু প্রার্থনা করে আসছে। তবু কেন বলা হয় প্রেমের গল্পকে--'অলস রোমান্টিসিজম্' ?—রূপালী ভাবছে। কলকারখানা, শ্রমিকের দুঃখদারিদ্র্য সব কিছু আছে, কিন্তু সেগুলো কি প্রেমের মত বিশ্বজনীন ? জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র আকাঙ্খা প্রেম, বুভুক্ষার ন্যায় স্থানকালপাত্র এর বিচারে নেই। বুভুক্ষার নিবৃত্তি হয় আহার্য্যে, প্রেমের নিবৃত্তি হয় না। পরিতৃপ্তি দ্বিগুণ আকাঙ্খা জোগায়। সুতরাং, হে ন্যুট্ হাম্‌সুন, তুমি হারলে।

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সোক্রেটীস্ প্রেম সম্বন্ধে প্লেটোর 'ফীড্রাস্' ও 'ব্যাঙ্কোয়েটে' অনেক তথ্য দিয়ে গেছেন, কিন্তু আসল বস্তুটি জানা কঠিন, আর কঠিন বোঝা রমণীর মন।

কিউপিড্, সাইকী! চিরপ্রেমের অভিনয়ে জড়িত অবস্থায় মর্ম্মের অমর হয়ে আছ তোমরা। উদ্ধে হাসছ উর্ব্বশী! উত্তর দাও তাহ'লে কেন তোমাদের শান্তি আসেনি? কেন নিত্য নূতন প্রণয়ের সন্ধানে তোমরা ধাবিত হয়েছে? উত্তর দাও আমার কানে, আমি ভিন্ন সকলে তন্দ্রাগত। কেউ শুনবে না। তোমাদের অমরত্বের মধ্যেও না বোঝার অক্ষমতা, অন্ধ অজ্ঞানতার কথা আমি ভিন্ন কেউ জানবে না।

আচ্ছা, আমি কি অসতী? রূপালী ভাবছে। একপুরুষের প্রেমে কেন আমার চিত্ত আবদ্ধ থাকত না শেষে? নিরাশা কেন আমাকে ম্লান করেনি? নব অভিযান তখনি মন আকর্ষণ করেছে। দেবতা উত্তর দাও রাত্রির কালো পার হয়ে পাণ্ডু চাঁদের প্রকাশ হয়েছে। আকাশের দিকে চেয়ে দু'হাত দিয়ে মুখ থেকে চুল সরিয়ে রূপালী প্রশ্ন করল! শীর্ণ, কঠিন দুইখানি হাত; বিবর্ণ, রুক্ষ চুল।

যারা ভালবেসেছে তারা তো একপুরুষ নিয়ে সংসার করে যাচ্ছে একমনা হয়ে। আমিও তো তাই চেয়েছিলাম, সেই চেষ্টা আমিও করেছি! কিন্তু, কেন আমার মন একে ছিল না? কখন এসেছে ঘৃণা, কখন আমি বেড়ে উঠেছি তাদের চেয়ে, কখন সামান্য অবহেলা বা অদর্শন আমাকে ভুলিয়েছে। কিন্তু কোন আঘাত আমাকে ধূলিশায়ী করেনি। কাকে আমি খুঁজেছি সারা যৌবন ধরে? দেখা তার পাইনি, কিম্বা পেয়েও চিনি নি। সে সন্ধানের বিরাম ছিল না। শিশুকাল থেকে স্বপ্নের মত ভেসে এসেছে—'কাউকে তোমার ভালবাসতে হ'বে।' এ আমার জ্ঞাত তথ্য ছিল, কিন্তু হায়, কে সে আমার ভালবাসার লোক?

আজ উত্তর দাও, দেবতা। এ খোঁজা কি তোমার জন্য ? তোমাকেই আমি চেয়েছি আমার অজস্র প্রণয়ীর মধ্য দিয়ে ? তবু অতৃপ্তি, সেও কি তোমারি বিরহে ? যে অমর আত্মার কণা মাত্র আমার অন্তরে, তার-ই আকর্ষণ সহস্র যোজন দূরে থেকে আমাকে ব্যাকুল করেছে ? চেয়ে দেখেছি সহস্র চেনা মুখে, যদি কোনও আলো সে মুখে দেখতে পাই। জীবনের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি দিনযাত্রায় পারিপার্শ্বিকের নিগড় ছেদ করে চিত্ত উধাও হয়েছে অজানা কল্পলোকে। আজও সে গতির অন্ত নেই। আজ পক্ষ ভারী, দেহ ক্লান্ত। তবু আমার মন সুদূর-বিলাসী।

দেবতা কখনও উত্তর দেন না রূপালী, আমি দিচ্ছি উত্তর। তুমি অসতী নও, তুমি প্রেমিকা, তুমি শিল্পী। অন্বেষণ শেষ করে এক পুরুষকে নিয়ে যারা থাকে, তারা প্রেমিকা নয়, তারা সতী। প্রাতঃস্মরণীয়া তারা। কিন্তু শিল্পীকে, কবিকে প্রেরণা জোগাবার জন্য তোমার মত মেয়েকে প্রয়োজন হয়। তোমার জন্য ট্রয় ধ্বংস হয়েছে, আবার হ'বে। তোমার জন্য ইওকানানের মুণ্ড ছিন্ন হয়েছে। এখনও কত অ্যাণ্টনী তোমার জন্য রাজ্য দিতে চায়। পাঞ্চালী, দিগন্তের শেষে দেখছি আসন্ন যুদ্ধ কুরুপাণ্ডবের। সেও তো তোমারি জন্য। কিন্তু, ভুল তোমাদেরও হয়।

পাশের ঘরে যাই, দেখে আসি একবার। রূপালী উভয় কক্ষের ভারী খয়েরী ভেলভেটের পর্দ্দা সরিয়ে ঢুকে গেল। তিন মিনিট। রূপালী ফিরে এসে চেয়ারে বসেছে। মুখ তার কঠিন, দৃষ্টিতে হতাশা ! ঘড়িতে আরও আধঘণ্টা বাজল।

রূপালীর ডাইরি—

‘দেবতা অনেক দূর !—তোমারি মাঝারে
খুঁজিলে হয়ত আমি পেতে পারি তাঁরে।
তোমার পূজার ফুল কভু কোনক্ষণে
নেবেন হাতেতে তুলি দেবতা গোপনে।’

মিশরের ক্ষীণ, নীলাভ জ্যোৎস্না। দূরে পিরামিড্, আরও দূরে জলস্রোত। অরণ্য ময়ূরকণ্ঠি, আলোছায়াতে রং তার বদলে যায়। কোথাও সিংহ ডাকছে—অস্পষ্ট গর্জ্জন সরু বনপথ দিয়ে যারা হাঁটছে তাদের ভীতি উৎপাদন করে। দুইটি মূর্ত্তি—তরুণ তরুণী। তরুণী রূপালী। সিংহের স্বরের প্রতিধ্বনিতে সে ভয়ে সরে গেল। অসীম তাকে সহাস্যে বলল,—ভয় কি, আমরা একসঙ্গে যাচ্ছি।

চারিধারে রোদ উঠেছে। কখন আর স্কুলে যাব ? মা কেন আমাকে ডাকেন নি ? রূপালী চোখ মুছে উঠে বসল—কি স্বপ্ন দেখছে সে ? আফ্রিকা—অসীম ! ‘একসঙ্গে যাচ্ছি’—মুখে একটা সলজ্জ হাসি ভেসে এল রূপালীর, কিন্তু আবার সে বিষণ্ণ হয়ে গেল।

নীচে চায়ের কেৎলি ঘিরে ছোট ভাইদের কলরব।

এতক্ষণে ওঠা হ’ল ? আর একটু শুয়ে থাকলেই পারতে ? চায়ের পাত্র আর মাখন-মাখানো রুটীর টুকরো ঠেলে দিয়ে মা নীরস স্বরে বললেন। সারা বধূজীবন হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে সম্প্রতি একটু স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেছেন তিনি। মেয়ের স্বপ্ন-বিজড়িত চলাফেরা দেখে বিরক্তির পরিসীমা থাকে না।

চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বিস্বাদ। আজ কিন্তু এ নিয়ে কিছু

কথা কাটাকাটি করতে প্রবৃত্তি হ'ল না রূপালীর। একটু বেশীক্ষণ ঘুমিয়েছে, তাই বলেই কি এমন একটা অনাসক্ত, নিরা-গ্রহভাব আসতে পারে? এবটা অজানা বিষাদ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

রুটী ঠেলে দিয়ে দুই তিন চুমুকে চা শেষ করে রূপালী ঘরে এসে বসল পড়বার জন্য। আজ ক্লাসে শক্ত একটা কবিতার ভাবার্থ লিখে নিয়ে যেতে হ'বে। কিন্তু কিছুতেই কবিতাটা বুঝতে পারল না রূপালী। না লিখি যদি, কল্যাণীদি বকুনী দেবেন। যাকগে যা হয় হ'বে, আজ আমি কিছু পারব না। রূপালীর মন জবাব দিয়ে বসল। সে তখন নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে নীল বনানীপ্রান্তে, যেখানে সিংহ ডাকছে, ঝরণা প্রচণ্ড বিক্রমে ঝরে পড়ছে। বনজঙ্গল, সিংহ, পিরামিড্, আবছা আলো কারুর ভাল লাগে না সত্য, কিন্তু স্বপ্নে এসব দেখলে মন খারাপ হ'বার মানে হয় না।

খেতে বসল রূপালী আবিষ্টভাবে। ঠাকুর সামনে পাতা থালায় পরিবেশন করে যাচ্ছে। বাবা, ভাইরা সব একসঙ্গে বসেছে।

ও ঠাকুর, দিদিমণির পাতে বেশী করে ইলিশের দম দাও না। আজকের মাছটা মন্দ আনেনি বিহারী। ও বলছে গঙ্গার ইলিশ। তা অবশ্য নয়। তবে মাছটা বেশ চাওড়া ছিল। পদ্মার মাছ বোধ হয়।

সহসা মনে পড়ে গেল রূপালীর প্রায় দুই বছর পূর্ব্বের একটি দিন। দেশে যাবার ষ্টীমার ফেল করে তারা গোয়ালন্দের হিন্দু হোটেলে একবেলা কাটাতে বাধ্য হয়েছিল। কাঁচা বাঁশের বেড়া কাঁচা মাটির বুকে। দরমা দিয়ে ঘেরা টীনের ছাদ। সেখানে তপ্তকটাহে গাঁজাখোর চেহারার ঠাকুর রান্না করছিল লঙ্কার ঝালে পদ্মার ইলিশ।

বাহিরে কোথাও খেতে বা থাকতে হ'লে রূপালীর অভ্যাস ইতস্তত শকুনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছু ময়লা আবিষ্কার করা এবং তা নিয়ে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করা। সেদিন কিন্তু রান্নার অপূর্ব্ব সুঘ্রাণে রূপালীর লোভের অন্ত ছিল না। খুঁৎখুতোনী তার চলে গেল, কৌতূহলীভাবে সে রান্না-ঘরের এলাকায় ঘোরাফেরা করতে লাগল ও মাঝে মাঝে তাদের ভাড়া-করা হোটেলের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ঘরে এসে মাকে খবর দিতে লাগল রন্ধনপর্ব্বের কতদূর—এখনি নামাবে মা, ঝোল। আবার নাকি ইলিশের ডিম দিয়ে চাটনী বানাবে বলছে। জানো মা ঠাকুর আমাকে কি বলেছে?

সেই পদ্মার ইলিশ! সামান্য মাছ এবং রান্নাকে ঘিরে সেদিন কত কৌতূহল, আনন্দ, জল্পনা! আজ পাতের ওপর মাছ রইল পড়ে, মায়ের কোন কথা তার কানে যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আজ দশদিন অসীম আসেনি। কেন আসেনি কে জানে? বড় কলেরা হচ্ছে কলিকাতায়। কেন সে আসছে না?

সমস্ত চিন্তা একপথ ধরে প্রবাহিত। ছোট ছোট সুখ তার কে হরণ করেছে? সংসারের ছোট ছোট কাজে পরিজনদের স্নেহসংলাপে যে মধু ক্ষরে পড়ত, সে মধুর উৎস আজ অন্যস্থানে। একজনের অভাবে সব কিছু বিরস হয়ে উঠতে পারে, এ রূপালীর প্রথম উপলব্ধি।

এর চেয়ে সেই পদ্মাতীরে থাকতাম যদি, মনে আমার শান্তি থাকত, এমন বেদনায় দিবারাত্রি বিমনা হ'তে হ'ত না।

ওকি রুলি, কিছুই তো খেলি না? বাস্ আসবার তো এখানো দেরী আছে। মাছটাছ সমস্ত যে পড়ে রইল।

মুখ ধোবার জন্য কলতলায় যেতে যেতে হঠাৎ যেন কোন আঘাত পেয়ে রূপালী গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত ফিরে মায়ের দিকে

তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। কিছু যেন আড়াল তার রইল না। মনের কোন সঙ্গোপন দুঃখের ভারে ইলিশের দম তার কাছে জলের মত স্বাদবিহীন হয়েছে, সে কথা তার মা যেন টেনে বের করে সকলের সামনে ছড়িয়ে দিলেন। এখনি তার বাবা, ভাই-এরা সকলে বুঝতে পারবে তার না খাওয়ার কারণ।

চিন্তামগ্ন চিত্তে হঠাৎ কথাগুলো বিরক্তিকর লাগল। একটা বস্তু থেকে মনটা যেন রূঢ় কষাঘাতে ফেরাতে চায় সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম, মায়ের অনর্থক অনুযোগ।

চাপা ক্রোধের স্বরে রূপালী জীবনে প্রথম স্পষ্ট, পরিষ্কার মিথ্যাভাষণ করল—খাব কি করে? সকাল থেকে আমার পেটের অসুখ্ করেছে না?

বইখাতা গুছিয়ে স্কুলের গাড়ীতে উঠে বসল রূপালী! তখনও তার চোখে স্বপ্নের ঘোর, মনে বিষাদ। কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না এ ভাব। সহপাঠিনীদের স্রোতে নিজেকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে নিজের মন খারাপের স্মৃতিতে রূপালীর হাসি পেতে লাগল। এই তো জীবন! কি আশা, আকাঙ্খা এর বক্ষে! দিনান্তের শেষে আছে গৃহ—সেখানে বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকারে পাটী বিছান। টবে বেলীফুলের গন্ধ, আকাশে জাগ্রত চন্দ্র। সেখানে তারা সকলে বসবে চায়ের পাত্র হাতে। কমলালেবুর রসের মত রঙীন চা। উষ্ণ পানীয় ফুল-আঁকা শাদা কাপের কানায় মুখ দিয়ে একটু একটু করে পান করায় কি আরাম! সামনে থাকবে নীলপাখী-আঁকা বড় কাঁচের থালায় ডালমুট মেশান চিঁড়েভাজা, তার মা নিজের হাতে ভেজে দেবেন! একটা বাদ্যযন্ত্র থাকবে, তারা সকলে থাকবে, আর—আর থাকবে অসীম। সেই তো এ জীবনোৎসবের কেন্দ্র।

সন্ধ্যা আরও নিবিড় হ'বে! ভাইএরা পড়বার ঘরে উজ্জ্বল বাতির নীচে উঠে যাবে। মামা উঠি-উঠি করবেন। মা মাঝে মাঝে একতলায় রন্ধনাগার পরিদর্শনে চলে যাবেন। দিবাশেষের ক্লান্ত, সুরভিত এক ঝলক বাতাস ছুটে আসবে। অসীমের তরঙ্গাকারে সাজান চুল এলোমেলো হয়ে যাবে, হার্‌মোনিয়ামটা টেনে নিয়ে অসীম গান ধরবে—

"প্রিয়, তোমার কাছে যে হার মানি
সেইতো আমার জয়।

* * * *

নিতি তব পাশে মানি পরাভব,
মিলে যে মোর জয় গৌরব,
অপরে ঘোষিলে জয়রব
চিত্তে বিঁধিয়া রয়।
তাই তোমার কাছে জিতিলে হারি,
হারিলে সে তো জয়!"

—অতুলপ্রসাদ

আর তার মনে লাগবে দোলা। সে ভাববে, এত গান থাকতে তার কাছে বেছে বেছে এই গানখানা করার মানে কি? নিগূঢ় একটা অর্থ খুঁজবার জন্য তার মন হ'বে ব্যগ্র।

এইটুকুই সুখ! এর বেশী সে চায়নি, চাইবার কথা তার মনেও আসেনি। সে ছিল বিবাহ-বিরোধী। শালগ্রাম, সিঁদূর, চেলী, গাঁটছড়া—এসব ভাবলেই গা ঘিন্-ঘিন্ করে উঠত। কেমন একটা বিতৃষ্ণা দেহমনকে আশ্রয় করত। অথচ, আশ্চর্য্য প্রেম করতে তার বিতৃষ্ণা ছিল না। তাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তার মত মেয়ের পক্ষে অসীম যে সাংসারিক হিসাবে নগণ্য পাত্র সে কথা সে বুঝেছিল। তার সঙ্গে বিবাহ হ'তে পারে না। বিবাহ সে

চায় না, ভালবেসেই তার সুখ। অসীম চিরকাল কুমার হয়ে থাকবে কি না, অসীম কি ভাবে দিন যাত্রা নির্ব্বাহ করে সে বিষয়ে তার ঔৎসুক্য ছিল না। তবে, অসীম যে ছদ্মবেশী রাজপুত্র এ চিন্তা তার মন থেকে তখনও যায়নি।

সেই মধুর দিনান্ত অপেক্ষা করে আছে বিদ্যালয়ের দীর্ঘ, একঘেয়ে দিনটির শেষে। জামরুল গাছের সূর্য্য-উজ্জ্বল পাতাগুলিতে ধীরে অন্ধকার নামছে—বড় জানালা দিয়ে দেখল রূপালী চেয়ে।

মেয়েদের দিকে তাকাল রূপালী অনুকম্পার চক্ষে—সকলে মাথা নামিয়ে দুরূহ অনুবাদে রত। এরা কি কেউ জানে তার সুখের খবর গোপনে কেমন করে অন্তঃসলিলা নদীর মত বয়ে যাচ্ছে? এরা কি কেউ জানে—এই যে রূপালী সাধারণ মেয়ের মত বসে লিখে যাচ্ছে পার্কারের নীল কলমে, তার আছে এক পরমসুন্দর যুবক প্রণয়ী? বাড়ী ফিরে গেলেই সে আসবে—কত কথা হ'বে উপন্যাসের মত!

গাড়ীতে বসে অনির্ব্বচনীয় সুখে রূপালীর চিত্ত প্লাবিত হয়ে গেল। দশদিন আসেনি সে, তার মানে আজ নিশ্চয় আসবে। না এসে ভাল করেছে, আজ এ আসার আশা তাহ'লে থাকত না। এসে গেলে তো ফুরিয়ে যায়, না এলে আশা থাকে। বড় মধুর সে প্রত্যাশা।

আঁকা-বাঁকা সরু রাস্তা দিয়ে মেয়েদের নামাতে নামাতে গাড়ী চলল বাড়ীর দিকে এগিয়ে। রাস্তাঘাট চেয়ে দেখেছে রূপালী মনে প্রবেশ করছে না কিছু। হ্যারিসন্ রোডের মোড়ে একটি মেয়ে কলার খোসায় পা হড়কে উঁচু-হীল জুতো সুদ্ধ পড়ে গেল, কাপড়ের দোকানে মূর্ত্তিগুলোর পরণে কি সুন্দর বারানসী,

কলার ঝাঁকা নিয়ে কলাওয়ালা চলন্ত ট্রামের পাশে পাশে ছুটছে— এসব কিছুই তার চোখে পড়ছে না। বাসে তার শ্রেণীর কোন মেয়ে নেই। ভালই হয়েছে। বাজে কথায় এ প্রিয় চিন্তার সুখটুকু পাওয়া যেত না।

একটি করে মেয়ে নামছে, আর সময় এগিয়ে আসছে। আজ দেখা হ'বে! আজ দেখা হ'বে! সর্ব্বদেহে সুখের অনুভূতি স্রোতের বেগে বয়ে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে সময় একটি দুর্লভ মুহূর্ত্তের দিকে।

মা বারান্দার তোলা উনুনে লুচি ভেজে দিচ্ছেন। কাছে উঁচু পিঁড়ির ওপর ভাই-এরা পদ্মকাটা রেকাবীর সামনে উন্মুখ হয়ে বসে রয়েছে। ঠাকুর ঘরে আলুর দমে পেঁয়াজ কুটে দিচ্ছে। ঝি চায়ের কেৎলিতে কল থেকে জল ধরছে। চায়ের পাত্রের ঠুনঠান্ আওয়াজ যেন একটি গান। মায়ের মুখে আলোর আভা যেন ছবির সৌন্দর্য্য। ছোট দৃশ্যটি রূপালীর চক্ষে অপরূপ কল্যাণময়, মধুময় দেখাল। সামান্য ঘরকন্না, সে-ও তার চোখে প্রথম প্রেমের স্পর্শে অসামান্য। একসঙ্গে দুইতিনটে সিঁড়ি টপকে রূপালী বই রাখতে ওপরে চলে গেল।

সন্ধ্যায় ছাদে একা বেড়াচ্ছে রূপালী। না, বেড়াচ্ছে না, রাস্তার দিকে চেয়ে রয়েছে। ক্রমে সন্ধ্যা ঘন হচ্ছে, রূপালীর মনে আসছে ভয়। তা হ'লে আজও এল না। আর আসবার সময় নেই কি? না, একটু পরে আসে ও। নিশ্চয় আসবে। উত্তেজনায় রূপালীর হৃৎপিণ্ড দুরুদুরু করতে লাগল। আলিসার পাশে উঁকি দিয়ে দেখল যে অসীমের মত কে যেন আসছে। ওই তো। কিন্তু কি ভুল তার? কুশ্রী, বিগত-

যৌবন লোকটিকে দূর থেকে দেখে অসীম বলে তার ভ্রম হয়েছিল! ওই লোকটি না, গেরুয়া রংএর পাঞ্জাবী গায়ে? না, অসীম আরও একটু ধীরে ধীরে হাঁটে, আরও দীর্ঘাকৃতি।

না, এল না সে! মন্দিরে সন্ধ্যারতি বেজে উঠল তারস্বরে, অন্ধকার গভীর হ'ল। কি হয়েছে অসীমের? যদি অসুখ করে থাকে? রূপালী যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করল। প্রেমকে চিরকাল দেবতার উর্দ্ধে স্থান দিলেও দেবতা থাকতেন তার সঙ্গে সঙ্গে। প্রেমের কাছে তিলমাত্র বাধা পেলে রূপালীর অন্তস্তল থেকে ক্রন্দন উঠত দূর কোন জনের উদ্দেশে? তাঁকে সে চেনে না, তার প্রণয়ীদের মত সর্ব্বদা তিনি তাকে বেষ্টন করে থাকেন না। কিন্তু, সে জানে তার সমস্ত তুচ্ছ প্রেমকাহিনীর অবশিষ্ট না থাকলেও, তার সহস্র প্রেমিক তাকে ছেড়ে গেলেও অবশেষে জেগে থাকবে তাঁর নির্নিমেষ দৃষ্টি। ভালবাসার জনের অভাব তার কোনদিন হ'বে না। প্রেমের, ঈশ্বরের সংযোগ যে নিবিড়।

বিরস চিত্তে কেটে গেল সন্ধ্যা, সন্ধ্যারাত্রি। উত্তেজনার অন্তে অবসাদ আশ্রয় করল রূপালীকে। অভিমানে চোখে তার জল এল। রাত্রে ছোটভাই রূপেনের পাশে শুয়ে অনেকক্ষণ জেগে রইল সে। উন্মীলিত নয়নের জলে উপাধান সিক্ত হ'ল। চিকনবসান, শুভ্র, ছোট বালিশটি ভিন্ন কেউ জানল না—এতদিনে কিশোরী প্রেমের কাঁটার খোঁচার স্বাদও পেয়েছে।

তবু, অশ্রুর মধ্যে ক্ষীণ আনন্দ আছে—আজ আসেনি, কাল তাহ'লে নিশ্চয় আসবে। আজ এলে প্রতীক্ষার আনন্দ কাল পাওয়া যেত না! এইতো রূপালীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য!

কেটে গেল রূপালীর জীবনের একটি দিন।

ছোটখাট হৃদয়ঘটিত ব্যাপার ঘটেছে কখন কখন। বহু পুরুষ আকৃষ্ট হয়েছে তার প্রতি। উৎসব সভায় দেখা, আলাপ হয়েছে। বাড়ীতেও তারা এসেছে পূজারীর ভঙ্গিতে। তখনও কারও প্রবেশের উপায় ছিলনা রূপালীর ধ্যানমগ্ন চিত্তে। অসীমের থেকে সুন্দর তারা কেউ নয়, মার্জ্জিত বাক্যবিন্যাস তার মত ঝলক দিয়ে ওঠে না। তবু তাদের পূজা তার ভাল লাগত। তাদের কথারও নিগূঢ় অর্থ সে ভেবে বা'র করত। গর্ব্ব হ'ত তার, হ'ত আনন্দ।

এমন সময়ে ব্যবসার একটা বিশেষ উন্নতিতে রূপালীর বাবা বাড়ী করে ফেললেন। গোপীনাথ ষ্ট্রীটের রাস্তা আর ভাড়াবাড়ী ছেড়ে চলে এলেন বালিগঞ্জে নিজের বাড়ীতে। অসীম আসত মাঝে মাঝে, আগের মত ঘন ঘন নয়। আভাসে ইঙ্গিতে বুদ্ধিমান সে, রূপালীর মায়ের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিতে অনিচ্ছা বুঝেছিল। এখন তো আরও প্রভেদ হ'ল।

তারপর অসীমের বিবাহ। যবনিকা।

তবু অসীমকে ভোলেনি রূপালী তখনও। সম্পূর্ণভাবে তাকে পায়নি সেইজন্য মনে আঁকা রইল মোহের রং। সে অস্থির হয়ে পড়ল না, চীৎকার করল না। শুধু তার মনে হ'ল, জীবনটা শূন্য হয়ে গেছে। নড়া দাঁত পীড়া দেয়। তুলে ফেললে ব্যথার মুক্তি, কিন্তু স্থানটা শূন্য। অসীমের বিবাহ-পত্রিকা কাকার হাতে দেখে রূপালী আস্তে আস্তে বসবার ঘরের চেয়ার থেকে উঠে জানালার সামনে দাঁড়াল। ক্ষণকাল। তারপর মুখ ফিরিয়ে স্বাভাবিক স্বরে বলল—নেমতন্ন চিঠির ডিজাইন্‌টা বেশ করেছে।

আমি তো জানতাম একদিন তার বিবাহ হ'বে। অন্যের

সঙ্গে। আমি তো জানতাম তার সঙ্গে আমার বিবাহ হ'বে না আর সত্য বলতে কি, আমি তা চাইনি। আমি চেয়েছিলাম কি জানি না। চেয়ারে মাথা হেলিয়ে রূপালী ভাবছে।—অপ্রিয় সত্য কখনও আমি ভাবতে চাইনি। মুখোমুখি পড়লে পরে ভেবে দেখব বলে মনকে স্তোক দিয়ে রাখতাম। তাই স্বাভাবিক পরিণতি সহসা আঘাত দিল। প্রস্তুত ছিলাম না।

ব্যথা? হ্যাঁ, তা পেয়েছি বইকি। পাব না? তবে এমন কিছু নয়। কারণ, দেখলাম তাকে আমি ভালবাসিনি। আমি বেসেছিলাম পুরুষকে—অসীম ছিল তার প্রতীক। সে ছিল রঙীন খেলনা, আমার দিবারাত্র খেলায় ভরে রাখত,—এইসব।

প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে গেল রূপালীর। তখন দিনগুলি যেন খালি। পড়াশোনা নেই, বাজে বই ছাড়া অবশ্য। বিদ্যালয়ে যাওয়া নেই। পাশের বাড়ীর নূতন ভাড়াটী মন্দার সঙ্গে সে নিজ স্বভাবকে অতিক্রম করে অযাচিত ভাবে আলাপ করল। মন্দা তারই বয়সী, বাড়ীতে পড়াশোনা করে, পাঁচ ভাই-এর এক বোন।

তাকে পেয়ে মন্দা আকাশের চাঁদ হাতে পেল। যে মেয়ে স্কুলে যায়, ক্লাসে ফার্স্ট হয়, যে মেয়ে জলের মত কবিতা লেখে, গান গায়, যার তনুদেহ শুভ্র পদ্মের মত; সে যে তার-ই মত কুণো ঘরোয়া মেয়ের আলাপপ্রয়াসিনী, তা মন্দা ভাবতেও পারেনি। সাগ্রহে, সানন্দে সে বন্ধুবরণ করে নিল। লাজুক রূপালীও সে বাড়ীতে আশ্রয় খুঁজে পেল। পাড়ার অন্যান্য মেয়েরা মিলে একটা আড্ডার সৃষ্টি করল। দ্বিপ্রহরে সেখানে লুডো, কড়ি, তাস, উলবোনা, পরচর্চ্চা সমস্ত হ'ত। নানাবয়সী বৌঝিয়েরা একত্র হ'ত। প্রথমে অনিচ্ছায়, শেষে আগ্রহে

রূপালী যোগ দিল। সেখানে কুমারী মেয়েদের সামান্যতম মোহের সন্ধান নিত রূপালী, কিন্তু বিবাহিতাদের স্বামী সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র কৌতূহল ছিল না। বিবাহ যে তার এলাকার বাহিরে।

প্রেম নেই আর, শূন্য, নিদারুণ শূন্য দিন। বাড়ী ফিরতে বিকালে রোমাঞ্চ হয় না কারুর আসার কথা ভেবে। নূতন শাড়ীজামা কিনে মনে হয় না এ সাজে তাকে একজনের চক্ষে ভাল দেখাবে। স্মৃতির ধ্যানে তন্ময়তার দিনও গত হয়েছে।

তবু এসেছে মুক্তি। প্রেমের থেকে, বন্ধনের থেকে মুক্তি। জগতকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল প্রেম, সমস্ত সৌন্দর্য্যকে, মাধুর্য্যকে আড়াল করে ছিল। আজ চোখ খুলে গেছে। নিরাসক্ত মনে রূপালী দেখছে চারিধার, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী। সম্মুখের তেলেভাজা খাবারের দোকানে বেসাতি নামিয়ে চুড়িওলী কেমন করে দোকানীকে হাসিগল্পে মজিয়ে ধারে একঠোঙা বেগুনি, পেঁয়াজি খেয়ে উঠল, সেটা আজকাল তার চোখে পড়ে। মাঠের ওপাশে একতলা বাংলোয় বিকাল হ'তে না হ'তে একদল মেয়ে হালকা বেতের টেবিলে চায়ের আসর জমায়। তাদের শাড়ীর পাড় থেকে হাতের কঙ্কনের কারুকার্য্য রূপালী একনিশ্বাসে বলে দিতে পারে। সব কিছুই যেন নূতন, সব কিছুই আশ্চর্য্য। চোখ মেলে চেয়ে দেখার যে কি সুখ তা রূপালী জানত না এতদিন। একজনের প্রেম থেকে মন বহির্মুখী হতে পারল এখন। মনে হ'ল চারি পাশের আবেষ্টনী তার এত মধুময় তা তো সে জানত না। এরা কেউ তুচ্ছ নয়। এরাও তাকে দিতে পারে অনেক।

বন্ধুরা তার ভালবাসে তাকে। বয়স্কা মেয়েরা তাকে পছন্দ

করে। আজ এর বাড়ী নেমন্তন্ন, কাল তার বাড়ী চা। সমস্ত মন মেলে ধরেছে রূপালী বাহিরের দিকে। এরও মূল্য আছে।

দ্বিপ্রহরের সভা—তার মাধুর্য্য সকাল থেকে আবিষ্ট করে রাখে। সন্ধ্যায় কখন বা লেকের ধারে বেড়াতে যাওয়া। নানা পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ। বনভোজন। জামার ছাঁটকাট তুলনা। শাড়ীতে পাড় বসান। পাশের বাড়ীর সমালোচনা। রাস্তার ওপাশের বাড়ী সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা। মন্দাকে কোন পাত্রপক্ষীয়ের দেখতে আসার উত্তেজনা। সংসার ও সমাজে মন ঢেলে দিল রূপালী। প্রেম নেই আর।

বেলা প্রায় তিনটে। মন্দাদের মার্ব্বেল-মণ্ডিত মেজেতে বসে রূপালী মন্দার জামায় কাজের নক্‌সা এঁকে দিচ্ছে। ঘরে ঢুকল খোকন, মন্দার একবছরের ছোট ভাই, গৌর, দীর্ঘ তনু।

ওকি পালাচ্ছিস্ কেন? এতো রুলি—মন্দা সস্নেহে ডাকল। স্কুলের বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিরুত্তরে বেরিয়ে চলে যাবার প্রাক্কালে খোকনের সাদা পাঞ্জাবীর কোণা দরজার হুড়্‌কোতে আটকে যাওয়াতে মুখ ফিরিয়ে থেমে তার সেটা খুলে নিতে হ'ল। আরক্ত-শুভ্র মুখের পার্শ্ব তার রূপালীর রূপমুগ্ধ চিত্তে সহসা নাড়া দিল। তীক্ষ্ণ চিবুক, রোমান্ নাসিকা, সঙ্কীর্ণ-দীর্ঘ নয়ন। নীলাভ গণ্ড-চিবুক। অল্পদিন হ'ল ক্ষুর পড়েছে। ছিপ্‌ছিপে সরল বাঁশের মত শরীর। রমণীসুলভ লাবণ্য কৈশোর ও যৌবনের মাঝামাঝি আট্‌কে রয়েছে। পৌরুষের পূর্ণ বিক্রম এখনও দেখা দেয়নি। তবু সে যে পুরুষ এ কথা অহরহ মনে আসে। মুখের ডৌল যেন গম্ভীরচিত্ত দার্শনিকের মত সমাহিত। কথাবার্ত্তা, চলাফেরা সমস্ত ছন্দোবদ্ধ, ধীর। শূন্য রূপালীর মন ছিল। 'নওল কিশোর' সেখানে প্রবেশ লাভ করলেন।

তৃষিত দৃষ্টি রূপালীর খুঁজে ফিরতে লাগল খোকনকে। সে যে বয়সে তার চেয়ে ছোট, নাম তার খোকন, সে যে বারে বারে পাস করতে না পেরে তৃতীয় শ্রেণীতে কায়েমি সত্ত্ব নিয়েছে, সুন্দর মাথাটি তার অলস চিন্তা, অসার বস্তুতে পরিপূর্ণ, সে কথা মনে হল না রূপালীর। পুরুষের পরিচয় চিরদিন সে যে পুরুষ এইমাত্র।

বহু বয়স্ক যুবকের সঙ্গে প্রেম করবার পর একটি অপরিণত কিশোরের প্রতি এ মোহ রূপালীর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তার মন ছিল ভিতরে শূন্য বাহিরে সে যতই কেন না সমাজ-জীবনকে আঁকড়ে ধরুক। অন্যভাবে নিজেকে নিয়ে মানুষ হ'বার জন্য, অল্প বয়সে গভীর তথ্য-সম্বলিত পুস্তকাদি পড়বার জন্য, অথবা মনের গঠনের জন্যই হ'ক, চতুষ্পার্শ্বের কারুর সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে তার মিলত না। চাপা প্রকৃতি কিন্তু নিজের পার্থক্যকে লুকিয়ে সকলের মধ্যে মিশে যাবার কৌশল শিখেছিল।

চিরএকাকী অন্তর তার আবার খুঁজে বেড়াচ্ছিল ভালবাসা। আর কেউ নেই সামনে, আশেপাশে, যাকে ভালবাসা যায়; যার মধ্যে মনের সমস্ত প্রখর বাসনা আশ্রয় পাবে। একজনকে চাই, তা সে যে কেউ হোক না কেন। আর কেউ নেই তার লক্ষ্যগোচরে, দিন তার কাটে না। পড়াশোনা এখন বন্ধ। বসন্ত সবে গত হয়েছে। এখনও তার রেশ বাতাসে। বাতাসে কি আকুলতা! গায়ে লাগছে এ বাতাস আর দেহমন পুলকিত হয়ে উঠছে। হরিৎ-সবুজ গাছের পাতা নৃত্য করছে জীবনের ছন্দে। আকাশ কি নীল! যেন অপরাজিতা।

একজনকে চাই, যাকে তার মন আবার জড়িয়ে ধরবে। তা সে যে কেউ হোক না কেন।

সাধারণ, নির্বুদ্ধি ছেলেটিকে হঠাৎ অসামান্য মনে হ'ল

রূপালীর। কুণো, লাজুক ভাবটি উচ্চদরের সমাজবিমুখতা বলে পরিগণিত হ'ল। মুখের অলস নির্লিপ্ততা উদাসীন বৈরাগ্যের আখ্যা পেল। সকাল পাঁচটায় ঘুম-ভাঙা কর্কশ সুরে খোকন যখন পাঠ করত—Jack ass—Jenny ass. He goat—She goat—তখন নিদ্রাকাতর রূপালীর কানে মধুবর্ষণ হ'ত। আহা, কি কৃচ্ছ্রসাধন!

আমি কি করতাম? দেখে যেতাম। জানি তার স্বভাব। কোন জটিলতার সৃষ্টি হয়নি। দুইদিন পরে দুইদিনের দেবতার চিরদিন বিসর্জ্জন হয়ে এসেছে। সুতরাং, আমি দেখে যেতাম।

তার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার চোখে ভেসে আসত 'ল্যাণ্ড্-সীয়ারের' ছবিখানি। অরণ্যের পুষ্পলতায় উপবিষ্ট বটম্। গাধার মুণ্ডে রক্তগোলাপের মালা। পরীরা তার সেবাশুশ্রূষায় রত। রাজ্ঞী টাইটেনিয়া প্রেম-আলিঙ্গনে তাকে বদ্ধ করে ধূসর, লোমবহুল গর্দ্দভবক্ষে নবনী-কোমল মুখখানি রক্ষা করেছেন। কানে বেজে উঠত সঙ্গে সঙ্গে শেকস্পীয়ারের 'মিড্সামারনাইট্স্ ড্রীম্'—টাইটেনিয়া বলছেন—

"—Mine ear is much enamour'd of thy note,
So is mine eye enthralled to thy shape;
And thy fair virtue's force perforce doth move me,
On the first view, to say, to swear, I love thee."

রূপালীর যে বয়স তাতে ছেলেদের দিকে উন্মুখতা স্বাভাবিক। কিন্তু, আবার খোকনের যে বয়স তাতে তার মেয়েদের অনর্থক লজ্জা করা স্বাভাবিক। দুইটি বিভিন্ন ভাবে টানাটানি চলতে লাগল—সমাবেশ একত্রে ঘটে উঠল না। মানসিক মোহটা শুধু লাভ হতে লাগল।

কলেজে ভর্ত্তি হ'ল রূপালী। মধ্যাহ্ন-আড্ডা ভেঙে গেল। নূতন জীবনের উদ্যমে কোন ক্ষতি বোধ হ'ল না। সহপাঠিনীদের সঙ্গে অবাধে সে মিশে গেল, আর—লজিকের অধ্যাপকের সঙ্গে প্রেমে পড়ল।

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে, অত্যন্ত সুপুরুষ। বিপত্নীক, ঘরে নাতি-নাতনী আছে, মেয়ের ছেলেমেয়ে। পুত্রবধূ আনবার সময়ও প্রায় হয়ে এল।

প্রথমদিন দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অবহেলার সহিত রূপালী বলেছিল—Excuse me. একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল তার।

সামনের খাতাটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অন্যমনস্কভাবে ভদ্রলোক মুখ তুললেন, Oh yes, come in. একটু হাসলেনও। লাল মখমলের খাপের মধ্য থেকে যেন ইস্পাত চমকে উঠল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল রূপালী। আধপাকা চুলে ভর্ত্তি মাথা, গায়ে ছাই রংয়ের আলোয়ান জড়ান, পুরোনো-চেয়ারে-বসা লোকটির এত রূপ! মনে হ'ল পুরুষের পক্ষে এত রূপ অপ্রয়োজনীয়। এ রূপের তারুণ্য না জানি কত মোহন ছিল? বেশভূষায় যত্ন নেই, যৌবন অস্তাচলে। তবু সারা মনে চমক লাগে। না লক্ষ্য করার উপায় নেই। সূর্য্যের আলোর ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় এর প্রকাশ। রুদ্ধদ্বারে আঘাত করে ঘুম ভাঙায়। আহা, কি সুন্দর! কী-ই সু-ন্দ-র!

তারপরে শোনা গেল আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর, নির্ভুল বিদেশী উচ্চারণ, অগাধ পাণ্ডিত্য। যদি এখানে আমি ভর্ত্তি না হ'তাম, এঁর দেখা জীবনেও মিলত না।

সকলের কাছে রূপালী অনায়াসে প্রফেসর চৌধুরীর রূপ-গুণের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হ'ল। ভদ্রলোক বয়স্ক, মাথায় রৌপ্যকেশ

—এতেই কারো কোনও সন্দেহ হ'তে পারে না। তার পিতার বয়সী লোকের রূপবর্ণনায় ক্ষতি কি? পড়ান ভাল তিনি, সকলেই পছন্দ করে। তবে কেনই বা তাঁর প্রশংসা সে করবে না? ভদ্রলোকের বাড়ীর পাশে একটি মেয়ে থাকত, তাকে অহরহ প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে তুলল রূপালী। মেয়েটির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হ'ল নিবিড়। কেউ কোনও পরিহাস করতে যেয়ে প্রফেসর চৌধুরীর প্রৌঢ়ত্ব স্মরণ করে নির্ব্বাক হ'ত। রূপার চুল বড় ছাড়পত্র।

শেলীর 'Kindred Soul' এর তত্ত্ব কি বলে জানি না। রূপালীর ক্ষেত্রে প্রথম দর্শনে প্রেম হয়েছিল। রূপজ সে প্রেম, কিন্তু তার বন্ধন ছিল শ্রদ্ধা এবং গুণানুরাগ। তিনটি দিন মাত্র ছিল লজিকের ক্লাস। সেই তিনটি দিনের আশায় রূপালী সারা সপ্তাহ প্রতীক্ষা করে থাকত। আগের দিনটিতে কি আনন্দ, উত্তেজনা! ক্লাসে সকলের আগে যাওয়া, প্রতিটি কথা বক্তৃতার আকণ্ঠ গেলা। সামান্যতম চলাফেরা ক্ষুধিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা। প্রতিটি মুহূর্ত্ত সঞ্চয় করে রাখা কৃপণের ব্যাকুলতায়। তারপরে অনুৎসাহ, নিশ্চেষ্টতা। আবার অপেক্ষা।

খোকনের দিকে তাকিয়ে নূতন দৃষ্টিতে তাকে দেখল রূপালী। হাসি পেল তার, ধিক্কার এল। একে সে ভালবেসেছিল? অপদার্থ ছোকরা একটা। কোথাও এর পুরুষত্ব নেই। টাইটেনিয়ার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে, চোখের প্রলেপ মুছে গেছে। গাধাকে সে গাধাই দেখছে এখন।

অল্পবয়সী ছেলেদের রূপালীর বড় কাঁচা, বড় অপরিণত বোধ হতে লাগল। বেছে বেছে সে বই পড়তে লাগল যা'তে প্রৌঢ় পুরুষের প্রেমবর্ণন আছে। 'জেন্ এয়ার' সে আবার পড়ল,

'ভিলেত' তার সঙ্গে। অধ্যাপক 'হেজারকে' লেখা শারলত্ ব্রণ্টের পত্রাবলীর অনুবাদ সাগ্রহে পড়ে ফেলল। হিউ ওয়ালপোলের 'ম্যারাডিক্ অ্যাট্ ফর্টি' বড় ভাল লাগল তার।

চল্লিশে পুরুষ! পূর্ণ হয়েছে সবদিক থেকে। পৌরুষ তার এসেছে এতদিনে। যৌবন সবেমাত্র গত, কিন্তু এখনও রেষ রয়েছে দেহমন ব্যেপে। পশ্চাতে তার অতীত, অজানা অভিজ্ঞতা। যৌবনের খরস্রোতে কত কূল ভেঙ্গে এসেছে সে। তাই পরিণত তার শক্তি, সংযত তার ধ্বংসলীলা। চাপল্য, অনভিজ্ঞ বাতুলতা কিছু তার নেই। সে বহু উর্দ্ধে যৌবনের। কিন্তু, এই যৌবনের ডাকে নীচে নেমে আসবার ব্যাকুলতা এখনও তার আছে।

যৌবন গত, জীবন ক্ষয়ের গতিতে। আর, কিছু দিন পরেই সব শেষ হ'বে। ভোগ যা হয়নি, আর হ'বে না। শক্তি শেষ হ'বে, বাসনার শেষ হ'বে। এখনও রয়েছে ক্ষীণ যৌবনস্পন্দন। হাত বাড়াও দুর্ব্বার ক্ষুধায় যৌবনের প্রতি। যা পাওনি নাও, নাও কেড়ে ছিঁড়ে। একটু পরেই আসছে মৃত্যু।

অনুভূতি হয় তীব্র, অতি তীব্র হয় আকাঙ্ক্ষা। স্বপ্ন দেখার দিন তার নেই! স্বপ্ন সে পার হয়ে এসেছে, পার হয়ে এসেছে সোনার তোরণ। দেহের দাবীকে রুদ্ধ করবার ক্ষমতা কোথায়? শিথিল ইন্দ্রিয়গ্রন্থী। জীবনের সত্যরূপ সে দেখেছে। এই চল্লিশে পুরুষ!

নিরালায় বসে ভাবত রূপালী এইসব কথা। আবার বাহির থেকে মন তার গুটিয়ে এল অন্তর্মুখী। ষোলোর খোকনের পরেই চল্লিশে চৌধুরী। প্রতিক্রিয়া।

কিশোরীর ভীতিসঙ্কুল কৌতূহল প্রৌঢ়ত্বে। কিশোরীর কৌতুক প্রৌঢ়ত্ব যৌবনপ্রয়াসী বলে। কিশোরীর গর্ব্ব তার

অপরিণত, অশিক্ষিত সত্তার আহ্বান এড়াবার সাধ্য নেই সর্ব্বগুণাধার, ভীতিপ্রদ, প্রাজ্ঞ প্রবীণের। চিরদিন ধরে তারুণ্যের মোহ বয়সকে ঘিরে কত রহস্য, কত মায়াজাল রচনা করে তাকে ভীতি ও কৌতূহলের ছায়াতলে অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি দিয়ে রেখেছে। সে আকর্ষণ অতি প্রবল। একবার তার কবলগত হ'লে বেড়িয়ে আসা কঠিন। সমবয়স্ক তরুণের প্রেমে তৃপ্তি আসে না, ছেলেমী মনে হয়। পূজা-করা ছেড়ে পূজা গ্রহণ করা সময়সাধ্য। যেন ব্রব্‌ডিঙ্‌নাগের রাজ্য থেকে লিলিপুটে পতন।

পড়াশোনায় দারুণ উৎসাহ দেখা দিল রূপালীর, যা অসীমের বিবাহের পরে ভাঁটায় ধরেছিল। লজিকের অজস্র বই সে পড়ে ফেলল। বি-এ ক্লাসের পর্য্যন্ত বইগুলি শেষ করল। তার দেবতার পূজার এই যে উপকরণ। প্রফেসার চৌধুরী দর্শনে অনার্স্‌ পড়ান। রূপালী স্থির করে ফেলল সে দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়বে ভবিষ্যতে। বক্তৃতার ফাঁকে যদি অধ্যাপক থামতেন সাগ্রহে পরের কথাগুলি জুগিয়ে যেত রূপালী। নির্ভুল উত্তর, প্রগাঢ় জ্ঞান রূপালীকে অধ্যাপকের দৃষ্টিগোচর করল। পড়াশোনায় ভাল বলে তার নাম রটে গিয়েছিল।

যৌবনের ডাকে বয়সকে নামতে হয়। যে মেয়ের তীক্ষ্ণবুদ্ধি হীরকখণ্ডের মত প্রদীপ্ত, মণিদপর্ণের মত, যার চোখ বক্তৃতার প্রতিটি অংশে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কোমল নিষ্পাপ যার মুখ, তাকে তো ভালবাসতেই হয়, তা সে মেয়ের সমান বয়সে হোক না কেন।

শিক্ষক ও ছাত্রীতে চলল নীরব আদান-প্রদান। অধ্যাপক না এলে সেদিন রূপালীর জগৎ অন্ধকার হয়ে যেত। আবার অধ্যাপক ক্লাসে এসে অভ্যস্ত স্থানে তাকিয়ে রূপালীকে না

দেখলে নিরুৎসাহ হয়ে পড়তেন। বক্তৃতা তাঁর সেদিন জমে উঠত না। বেঞ্চের প্রান্ত থেকে একটি হৃদয়ের উত্তাপ এসে তাঁকে স্পর্শ করে যেত না। একজনের জন্য নিজের সমস্ত বিদ্যা, জ্ঞান, শিক্ষা উজাড় করে ধরবার প্রয়োজন হ'ত না সেদিন। নিঃসঙ্গ, ব্রহ্মচারী জীবনে তাঁর যে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত হ'ত, তার আভাস সেদিন পাওয়া যেত না।

চোখে চোখ পড়ত। দেবতার করুণায়, স্নেহে অধ্যাপক চেয়ে দেখতেন। শ্রদ্ধা ও প্রেমে উজ্জ্বল হয়ে উঠত কিশোর নয়ন। কখন বা বয়স্ক জ্ঞানীর ওপর জোর খাটিয়ে মজা দেখত রূপালী। কখন পরিহাসচ্ছলে কিছু কথার ছুতো ধরে মুখ ভার করে উঠে বেরিয়ে যেত স্পর্দ্ধার সঙ্গে—Excuse me! প্রবীণ শিক্ষক তরুণ যুবকের মত ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। তার ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেবার, ক্লাসের নিয়মে তাকে আনবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। শুধু অন্য মেয়েদের মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতেন ইংরাজীতে, ও চলে গেল কেন? ও রাগ করল কেন? আমি তো কিছুই বলিনি। মলিন হয়ে যেতেন, পড়ানর ভানও সেদিন তাঁর সম্ভব হ'ত না।

মেয়েরা মুখ টিপে হেসে চুপ করে থাকত। বয়স্ক অধ্যাপকের প্রতিভাশালিনী ছাত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বিচিত্র কি?

আবার কখন অন্য মেয়ের ওপর একটু পক্ষপাত দেখিয়ে তিনিও মজা করতেন—আঃ মিস বোস, তোমার লেখাটা আজ বড় ভাল হয়েছে। আমার কাছে তুমি ছুটির পর এসে একখানা বই নিয়ে যেও। প'ড়ে দেখো। তোমার সাহায্য হ'বে। আড়চোখে রূপালীর দিকে চেয়ে একটু হাসতেন—প্রবাল-খচিত অধরে ঈষৎ বিদ্রূপ মিশ্রিত বঙ্কিম হাস্য! শুভ্রকেশের ছাড়পত্র আছে।

রূপালী নির্ব্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখত, রাগে তাকে বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘের মত স্তব্ধ দেখাত, আসন্ন প্রলয় এখনি ঘটতে পারে। তার জীবনে গৃহের আবেষ্টনে কখন ঈর্ষা বা প্রতিদ্বন্দ্ব আসেনি। ঈর্ষা এখন এল না। অনুভূতি দিয়ে সে বুঝেছে ঈর্ষার কারণ ঘটেনি। রমলা বোসের ওপর তার বিন্দুমাত্র রাগ হ'ত না। রমলা তার চেয়ে নীচুতে সে তা জানে। প্রফেসার চৌধুরীর মনে রমলার কোন স্থান নেই। ছেলেবেলা থেকে প্রেম করে করে পুরুষ ভালবাসে কিনা সেটা সে বুঝতে পারে। তবে কেন তিনি তাকে নিয়ে খেলতে চান? কি স্পর্দ্ধা!

জীবনে প্রথম রূপালী বুঝতে পারল তার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যার জন্য সমস্ত পুরুষ অধ্যাপক তাকে পছন্দ করেন। সে কি পড়াশোনায় ভাল বলে? পড়াশোনায় ভাল তো অনেকে আছে মেয়েদের মধ্যে। তাদের মধ্যে কার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁরা পড়ান? কার রচনা যত খারাপই হোক তাঁদের চক্ষে অতুলনীয়? কার প্রশংসায় তাঁরা পঞ্চমুখ? কার মনোরঞ্জনে তাঁরা ব্যগ্র? কাকে তাঁদের দৃষ্টি ভিক্ষার্থী হয়ে অনুসরণ করে? না, এ পড়াশোনার প্রশ্ন নয়। অন্য কিছু।

জীবনে এত পুরুষের সংস্পর্শে আসেনি রূপালী। তার জগতে আত্মীয়স্বজন ভিন্ন মাঝে মাঝে মাত্র বাহিরের লোক ছিল। একসঙ্গে এত বিভিন্ন বয়সের ও পুরুষের কেন্দ্রস্বরূপা যে হয়নি পূর্ব্বে। তার তাই এল গমনে রাণীর গৌরব, ব্যবহারে স্বকীয়তা। সে বুঝল সে যে সে, তাই পুরুষকে মোহিত করে রাখবে। সে অন্য মেয়েদের চেয়ে স্বতন্ত্র। সকলের মধ্যে সে বিজয়িনী, সেটার যেন প্রমাণ হয়ে গেল, তার প্রথম কলেজ-জীবনে।

রূপালীর চরিত্রের সম্যক উন্মেষ তখনও হয়নি। অন্যান্য

মেয়েদের মত তার জীবন বা মন কিছুই ছিল না। প্রেম ছিল তার জীবন। প্রেমের জন্য প্রেমের মধ্য দিয়ে যতটুকু বিকাশ প্রয়োজনীয়, তাই হচ্ছিল তার ক্রমে ক্রমে। এতে বয়সের কোন হাত ছিল না।

নিজের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করবার পূর্ব্বে রূপালী ছিল ভীরু। এখন তার মধ্যে দেখা দিল অভিমান ও আত্মবিরোধ। তুচ্ছাদপি-তুচ্ছ কারণে তার আকণ্ঠ অভিমান হ'তে লাগল প্রণয়াস্পদের ওপরে। তাঁকে আঘাত দিতে সে কুণ্ঠিত হ'ত না মানের প্রাবল্যে।

যদি প্রফেসর চৌধুরী তাকে বলতেন—মিস্ লাহিড়ী, বইখানা মিস্ বোসের পড়া হ'লে তুমিও নিয়ে পড়ো—মুখচোখ লাল করে সতেজে রূপালী উত্তর দিত—না।

প্রফেসর আশ্চর্য্য হ'তেন—কেন?

উঠে দাঁড়িয়ে স্পর্দ্ধার সঙ্গে রূপালী উত্তর দিত—Because I do not like to.

বাড়ীতেও মাঝে মাঝে জুটে যেত অনুরাগী। মোহিত ছিল একজন। রূপালীর মায়ের গ্রামসম্পর্কে আত্মীয়। দূরদেশে থাকবার জন্য দেখাশোনা হয়নি আগে। এবার শীতে কলিকাতায় বেড়াতে এসে আলাপ হ'ল। বয়সে অনেক তফাৎ, সম্বন্ধ বিয়েতে বাধে। কাজেই স্নেহের ভানেই মোহিত রূপালীর সঙ্গে প্রেম বিনিময় করতে চাইল।

প্রথম দর্শনে লোকটার ওপর ঘৃণা এল রূপালীর। চেহারাটা স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল হ'লেও মুখটা কেমন যেন বয়স্কা স্ত্রীলোকের মত গালভাঙা, ঈষৎ তোবড়ান। হাতের নখের নীচে ময়লা জমে কালো দাগ। সর্ব্বদা ঘামছে লোকটা, রুমাল ব্যবহার করার

সভ্যতাও নেই। হাতের আঙুল টেনে টেনে কপাল থেকে ঘাম চেঁছে মাটীতে ফেলছে। পায়ে আছে বাটার শাদা জুতো, তাতে শাদা রংটারই যা অভাব। হোক না কেন বিদ্বান, ডবল্ এম-এ, হোক না কেন বড় ফুটবল-খেলোয়াড়, লোকটি বড় অসভ্য।

কেমন একটা নির্লজ্জ কামনার প্রকাশ সর্ব্বদেহে! তাতে কামই আছে, প্রেম নেই। সর্ব্বদা যেন রূপালীকে সে চাইছে চোখ দিয়ে গ্রাস করতে। নিজের কৃতিত্বের বিষয়ে নানা মিথ্যা কথা বলে, অসংখ্য চাল দিয়ে সে রূপালীকে আকৃষ্ট করতে চাইল।

দেখি তোমার হাতের লেখা, রুলি। দেখি, এস না, লজ্জা কি? কররেখা পরীক্ষার ছলে হাতখানাকে ধরে টিপে টিপে মনের লালসা জানাবার চেষ্টা করত। নানা রকম বিদেশী প্রথায় আঙুল দিয়ে হাতের তালুর ওপর এঁকে দিত, যার মনে হয় ইংরাজি মতে 'I love you,' কারণে, অকারণে তাকে স্পর্শ করে, চুলে টান দিয়ে, গালে হাত দিয়ে, হাত ধরে উত্যক্ত করে তুলেছিল এই মোহিত। রূপালীকে সকলে ছেলেমানুষ বলে দেখত, মোহিতও আত্মীয়স্থানীয়। স্নেহের ছলে তার এ অত্যাচারে কিছু বলার ছিল না।

স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে যেত রূপালী। একটা অস্বস্তি, অজানা ভীতি আসত তার। ভালবাসা অনেক এসেছে, কিন্তু দেহের সম্পর্ক ছিল না। মনে মনে অনেকক্ষেত্রে কামনা করলেও হাতটিও স্পর্শের কথা ভাবেনি সে। সৌন্দর্য্যপূজারীর দৃষ্টিতে প্রেমাস্পদের দেহ সে দেখে গেছে। কখন অন্যমনা হয়ে চিন্তা করেছে, সে দেহের স্বাদ কেমন। এইমাত্র।

আজ এই যুবক তাকে চাইছে, স্পষ্টতঃ তাকে চাইছে, দেহের দিক থেকে। তার মনের মানুষ একে দেখে ঘৃণায় মুখ ফেরায়, কিন্তু স্পর্শ অত বিতৃষ্ণা জাগায় না। অস্বস্তি লাগে, কিন্তু

পুরুষের পৌরুষ স্পর্শে একটা উত্তাপ, একটা আরাম অনুভূত হয়। কাছে এগিয়ে আসত মোহিত। বিতৃষ্ণা হ'ন। অস্বস্তি লাগত, এই বুঝি গায়ে হাত দেয়। ভয় করত, চলে দূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হ'ত, কিন্তু সরে যেতে পারত না। এই স্পর্শ করছে! না! না! চীৎকার করে উঠবে সে এখনি। এত স্পর্দ্ধা সহ্য করবে না কখন। কিন্তু বাহুতে তার রুক্ষ, উষ্ণ করতল মোহিতের—তোমার হাতের গঠন ভারী সুন্দর, রুলি। একসারসাইজ কর বুঝি রোজ? কি কি কর বল তো?

আরাম বাহু বেয়ে সারা শরীর জড়িয়ে ধরেছে। কর্কশচামড়া-মণ্ডিত হাতখানা তার মসৃণ, নবনীকোমল হাতের ওপর দিয়ে মর্দ্দন করে যাচ্ছে। কি আরাম লাগে! একেই বুঝি স্পর্শসুখ বলে?

ছাড়ুন না—মুখে ক্ষীণ প্রতিবাদ করে হাত ছাড়াবার অনাগ্রহ, সামান্য চেষ্টা করল রূপালী। নইলে মান থাকে না, আর মেয়েদের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক।

—নিজে ছাড়াও দেখি। হাত এত নরম কেন, যেন কচুর ডগা? একসারসাইজ তুমি কখনও কর না। দেখি কত জোর।—হাতখানা জোরে পেষিত করল মোহিত মুখের দিকে তাকিয়ে। চোখ তার জ্বলে উঠেছে বাসনায়, বিস্তৃত অধরে লুব্ধতার ছাপ। ব্যথা লাগল না রূপালীর, লাগল ভাল। সে নিজে থেকে কিছু করবে না ঠিক। আভাসেও সে উৎসাহ দেবে না। গা ছেড়ে দিয়ে দেখবে কেবল কতদূর গড়ায়। সবটা মোহিতের উপর নির্ভর করছে, পরের ধাপ কোথায় উঠবে কে জানে! একটা কৌতূহল, কৌতুক নিয়ে রূপালী প্রত্যাশা করে থাকত।

মোহিতের অতি সন্নিকটে দাঁড়িয়ে তার সহ্যশক্তি পরীক্ষা করে দেখত। কখন এমন কথা বলত যাতে কপট কোপে

মোহিতকে তার পৃষ্ঠে বা অন্য কোথাও লঘু চপেটাঘাত করে শাস্তি দিতে হয়। বেশীদূরে এগোতে তাকে দেবে না এটা ধ্রুব সত্য জানত রূপালী। কিন্তু, ক্ষতি কি এতে? সামান্য খেলা মাত্র। ক্ষতি কি? একান্ত ঘৃণা সে করে মোহিতকে। সেই ঘৃণা তাকে রক্ষা করবে। কি বিশ্রী দেখতে, আর কি নোংরা! ওকে ভালবাসার কথা স্বপ্নেও রূপালী ভাবতে পারে না। ওর নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে পরিজনদের কাছে। তবু সে তো একজন পুরুষ, একজন বলিষ্ঠদেহ, সবল পুরুষ। একটি শিক্ষিত, বয়স্ক ব্যক্তি, পশ্চিমের কলেজে পড়ায়। কত ছেলের তার হাতে জীবনমরণ, কতলোক তার কথা শোনে। এমন লোকটিকে সে ওঠবস করাতে পারে। এতে কি কম গৌরব? ওঠবস করানর বিদ্যাটা রূপালীর শিখতে হ'ল না, আপনি আসত। সব মেয়েরই আসে জানি। বিরাগ সত্ত্বেও মোহিতকে দূরে ঠেলে সরান রূপালীর ঘটে উঠত না। পারত না সে দৈহিক আকর্ষণের উর্দ্ধে উঠতে। প্রফেসর চৌধুরী গ্রীক সৌন্দর্য্য আর কুরঙ্গ নয়ন নিয়ে জেগে থাকুক না কেন মনে মনে অনিমেষে। তাঁর ক্লাস তো মোটে তিনটি দিন। বাকী সময় তার কি করে কাটবে? কি করে কাটবে তার আবেশ-মদির সন্ধ্যাগুলি, যখন তপ্ত বাতাস শীতল হয়ে যায়? টবের বেলীর গন্ধ উঠে আসে। পুরুষ ফেরে নীড়ে তার সঙ্গিনীর পাশে। পাশের বাড়ীর মন্দার এক কলেজ-পড়ুয়া ছোকরা প্রণয়ী জুটেছে। বারান্দায় দুইজনে কি গায়ে-গায়ে ঠেকিয়ে হাসাহাসি। সেদিকে চেয়ে ছাদে বেড়াতে বেড়াতে রূপালীর বুকের মধ্য থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে! ছেলেবেলা থেকে অসীম যে তার খারাপ অভ্যাস করে দিয়ে গেছে। সন্ধ্যা একা কাটান দায়।

প্রথম প্রেমের যাদুমন্ত্রে যে দেহ সুপ্ত ছিল স্বপ্নের আচ্ছন্নতায়, আজ সে আবার জেগে উঠতে চায় মোহিতের লালসার স্পর্শে। যতই অস্বীকার করুক রূপালী মুখে, প্রথম প্রেমের অপমৃত্যু তার মনের একনিষ্ঠতা নষ্ট করে দিয়ে গেছে। স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে, দেহ জেগে উঠছে। একসঙ্গে বহুর প্রেমে চটুলতা প্রথম প্রেম বিদায়ক্ষণে তাকে শিখিয়ে গেছে।

আমার মনটা শক্ত একেবারেই ছিল না। ছিল নরম। তবু একজনের বিদায়ে আমি অধীর হয়ে কেন পড়তাম না? কারণ তখনি আর একজন রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিত। ব্যথা ভুলে যেতাম। প্রহৃত শিশুর ব্যাকুল অভিমানে পুরাতন প্রেমের কাছ থেকে ছুটে যেতাম নূতন প্রেমের দিকে আশ্রয়লাভের ব্যগ্রতায়। বেদনা এত বেশী হ'ত যে তার উপশমের জন্য নূতন প্রেমের প্রয়োজন ছিল।

রূপালী কার্পেটের ওপর পাদুটো একবার ঘষল। আঃ, এত গরম লাগছে কেন অগ্রহায়ণ মাসে? উঠে পাখাটা আবার খুলে দিল রূপালী। বড় আলো নেভান, শুধু টেবিলের আলোটি জ্বলছে। জানালা দিয়ে পাণ্ডু চাঁদের আলো এসে ওপাশে দোলান-চেয়ারটার ওপর লুটিয়ে পড়েছে। আবার ঘড়ি সময়ের দ্রুতগতি নির্দ্দেশ করে দিল। প্রভাতের কত বা বিলম্ব আছে? রাত্রির স্বপ্নও যে তার শেষ হয়ে যাবে।

ক্যাওড়ামেশান ঠাণ্ডা জল, কাঁচের কুঁজো থেকে ঢেলে মুখে তুলল রূপালী রূপোর কটকী গ্লাসে। ঠাণ্ডা জল! ক্যাওড়ার গন্ধ ভাল লাগে তার। কত বিগত উৎসব দিনকে ডেকে আনে স্মরণে; কত বিবাহ বাসর, কত ভোজের আসর! মনে পড়ে যায় চেলাঞ্চলের ঝিকিমিকি, কর্ণাভরণের আন্দোলন। সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র কার বাতাসে উড়ছে, চলাফেরায় বন্য হরিণের

সহজতা? কাল চোখে কার বিদ্যুৎ? হাতে গলায় ফুলের মালা জড়ান। আধফোটা বেলীফুল, শুভ্র মুক্তার মত। এখন সে রূপালী কোথায় হারিয়ে গেছে? আজকের জরাজীর্ণ রূপালীর মধ্যে সে রূপালীকে খুঁজ না। তরবারীর মত তার ছিল দীপ্তি, সমস্ত দেহে বসন্তের জয়গান।

গ্লাসটা মার্ব্বেল-তেপায়াতে রেখে রূপালী হংসমিথুনমীনাখচিত মশলাদানী খুলে একটি ছোট এলাচ মুখে দিল। একদিন এই একটি এলাচে উত্তেজনা আসত তার, আজ সহস্র এলাচ চিবিয়ে গুঁড়ো করলেও শীর্ণ হাড়ের মধ্যে একটুও স্পন্দন জাগবে না।

আবার আলোর সামনে বসল রূপালী। দিনগুলি বড় চমৎকার কাটছিল। ডাইরি তখন প্রায় অলেখা অবস্থায় পড়ে থাকত। মন ছিল পরিপূর্ণ, কোন আক্ষেপ চিত্তে ছিল না। সেই দিনগুলি কি মধুর! প্রেমের লীলা আছে, ব্যথা নেই।

অনন্ত প্রেম! প্রকৃত প্রেম! বড় বড় কথা বলে সবাই। রূপালীর অধরে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি দেখা গেল। একনিষ্ঠচিত্তে সারা সত্তা দিয়ে যথার্থভাবে কাউকে ভালবাসার বোকামী তার ঘটছে বহুবার। কি যন্ত্রণাদায়ক সে প্রেম, কি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-সঙ্কুল! সারা বিশ্ব যেন তার একটি বিন্দুতে সংহত, সে বিন্দুটির বিচ্যুতি ঘটলেই তার জগৎ খসে পড়বে। আর, কয়েকজনকে একত্রে ভালবাসায় শান্তি থাকে। জগৎ টুকরো টুকরো ছড়ান। একদিক ধসে পড়লেও অন্যান্য অংশ ঠিক থাকবে। সেখানে আশ্রয় মিলবে।

যতবার আমি একজনকে ভালবেসেছি, পেয়েছি কষ্ট। ক্রীড়াপুত্তলিকা হয়েছি অন্যের হাতে। অন্যের নিশ্বাসে নিশ্বাস পতন, অন্যের বিমুখতায় মৃত্যু। সারা জীবন যেন অস্থির হয়ে

থাকত। কোথাও শান্তি ছিল না, একটি স্থান ভিন্ন। আশঙ্কা হ'ত প্রতিপদে। যদি এ প্রেমের অবসান ঘটে, আমার কি হ'বে?

টেবিলের সবুজ মরক্কোতে হাতের আঙুল অধৈর্য্যে রূপালী বাজাল। টক্ টক্ টক্। শোন, শোন, শোন। শোন আধুনিকারা, একজনকে ভালবেসে তার ইঙ্গিতে চলাফেরা কর না। অসুখী হ'বে। আমার কথা শোন। সারা জীবন আমার কেটেছে প্রেম নিয়ে। এই পার্কসার্কাসের ত্রিতল কক্ষে বিনিদ্র আমি একা। চোখ খুলে গেছে আমার, মোহশূন্য দৃষ্টিতে দেখে বলছি তোমাদের। যদি বেশী ভালবেসে ফেল, অসুখী হ'বে। কি? ততটা ভালবাসাই অন্যপক্ষ থেকে পেলে অসুখী হ'বে কেন? বোকা! যখন সে দৃষ্টির আড়ালে যাবে, মনে হ'বে হৃৎপিণ্ড ফেটে পড়ছে ব্যথায়। তার সামান্য মাথা ধরলে শঙ্কায় তোমার হৃদয় কাঁপবে। তার তুচ্ছ অবহেলায় দিবারাত্রি বিরস হয়ে যাবে। আর, সে মুখের কাছে মুখ নামালেই তুমি অত্যন্ত চিত্ততারল্যে এলায়িত হয়ে পড়বে। প্রতিদান দিতে পারবে না। সে হ'বে অতৃপ্ত! শোননি, ভাল প্রেম সে-ই করতে পারে, যে সে সময়ে নিজেকে একটু স্বতন্ত্র করে সরিয়ে রাখতে পারে? জাননা যে মেয়ে সম্পূর্ণ ধরা দেয়না, তাকে ধরার জন্যই পুরুষের ব্যাকুলতা।

কেন শেষ পর্য্যন্ত আমি প্রেমের কাছে হেরে গেলাম? আমার অদৃষ্ট! আমি যা বলছি তাই কর, আমি যা করেছি তা কর না।

মোহিত চলে গেল। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখবার জন্য এক ভদ্রলোককে রাখা হ'ল রূপালীর জন্য বাড়ীতে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ,

যৌবন-সীমায় উপনীত রঞ্জন রায়। একটি কর্ণের অর্দ্ধেক বন্দুকদুর্ঘটনায় নেই, চোখ ট্যারা। তখন গরমের ছুটী কলেজে। সন্ধ্যায় তিনি আসতেন।

বিশেষত্ব ছিল তাঁর। তিনি ভালভাবে এম-এ পাস করে লেখাপড়ার চর্চ্চা রেখে গান শেখাতেন। জীবনে উন্নতি হয়নি তাঁর প্রচুর-শিক্ষা এবং স্বভাবমিষ্ট কণ্ঠ সত্ত্বেও। তাই নিজের মধ্যে নিজেকে লুক্কায়িত করে থাকতেন তিনি। রূপালীর কাকার বন্ধু তাঁকে ঠিক করে দিয়েছিলেন অনেক গুণব্যাখ্যা করে। কাকা সেগুলি শ্রদ্ধা উদ্রেকের জন্য ভাবীছাত্রীর কর্ণগোচর করেছিলেন ডালপালা সমেত। একটা 'গুণে মন ভোর' ভাব এসেছিল রূপালীর—প্রথম দিন ভদ্রলোকের বীভৎস মূর্ত্তি তাকে বিচলিত করলেও বিশেষ নিরাশ হয়নি সে। কারণ, ওই রকম ব্যক্তির সঙ্গে তো ভালবাসা হ'তে পারে না। কেবল গান-শেখা নিয়ে সম্বন্ধ।

উদাসীন দৃষ্টিতে ছাত্রীর দিকে তাকিয়ে রঞ্জন রায় পরম অবহেলার সহিত জিজ্ঞাসা করলেন—গান কতদূর শিখেছ তুমি ?

সম্ভ্রমে সঙ্কুচিত ভাবে আসন গ্রহণ করল রূপালী—মেশো-মশায়ের কাছে অল্প শিখেছি। কোন ওস্তাদের কাছে শিখিনি।

ওঃ, আচ্ছা একটা গান শোন। বাস্ক-হার্‌মোনিয়াম্ টেনে অকস্মাৎ ভদ্রলোক খাপছাড়া ভঙ্গিতে গান ধরলেন, রূপালীর আসন-গ্রহণের অবকাশটাও সহ্য হ'ল না।

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখি জাগো।
মেলি রাগ অলস আঁখি, অনুরাগ অলস আঁখি
সখি জাগো।

নিবিড় এ নিশীথে
জাগো ফাল্গুন গুণ-গীতে
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে
মম নন্দন-অটবীতে পিক মুহুমুহু ওঠে ডাকি
সখি জাগো।
জাগো নবীন গৌরবে নব বকুল-সৌরভে,
মৃদু মলয়-বীজনে জাগো নিভৃত-নির্জ্জনে।
আকুল ফুলসাজে জাগো মৃদু কম্পিত লাজে,
মম নিভৃত-শয়ন মাঝে শোনো মোহন মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি
সখি জাগো।"

—রবীন্দ্রনাথ

ব্যথিত অন্তরের অন্তস্থল হ'তে দীর্ঘশ্বাস উঠেছে। এস, এস তুমি, এস এস। যৌবন তোমাকে ডাকছে, তবু তোমার আঁখিতে নিদ্রা! প্রতীক্ষু বসন্ত পুষ্পসৌরভে শুধু ব্যাকুল হ'বে? আমার মনের মণিকোঠায় যে বুভুক্ষু পুরুষ অহরহ তোমাকে প্রার্থনা করছে, তাকে তুমি তার বাহিরের দীনতা দেখে প্রত্যাখ্যান কর না। বাহিরে উদাসী, ভিতরে আমি বিরহী। প্রেম আসেনি আমার জীবনে। তবু আমি তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু, হে প্রিয়তমা, তোমার নিদ্রা যে আজও টুটল না?

সে সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। সে গান আমিও শুনেছিলাম। ওই ব্যাকুল প্রার্থনা সে গানের মধ্যে রূপালীর মত আমিও বুঝতে পেরেছিলাম। সে সঙ্গীত আশ্চর্য্য।

তিনি প্রায় প্রত্যহ আসতেন, সন্ধ্যায় অর্দ্ধমলিন বেশে।

নীরবে গান শেখাবার জায়গায় বসে থাকতেন দেয়ালের প্রতি তাকিয়ে উন্মনা ভাবে। রূপালী এসে বসত। তারপর দীন-বেশীর কণ্ঠে সম্রাটের মর্য্যাদায় সঙ্গীত দেখা দিত। সুধা-প্লাবনে সংসার স্তব্ধ হ'য়ে শুনত।

সে গান সমস্ত প্রাণ দিয়ে নিজের কণ্ঠে তুলে নিতে চেষ্টা করত রূপালী ঐকান্তিক সাধনায়। ছাত্রীর কৃতিত্বে বা মনোযোগে বেশী উৎসাহিত হ'তেন না রঞ্জন রায়, বেশী কথা বলতেন না। তাঁর কাজ তিনি ক'রে যেতেন কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার সঙ্গে। যতটুকু সময় যেদিন থাকা প্রয়োজন তার তিলার্দ্ধও অধিক তিনি থাকতেন না। অথচ বিন্দুমাত্র অবহেলাও ছিল না তাঁর।

কাকার কাছে শুনেছে রূপালী রঞ্জন রায়ের মানসী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন দৈহিক দীনতার জন্য। তিনি আজও কুমার। বাড়ীর লোকেরা তাঁর প্রতি বিরূপ ছিলেন উপার্জ্জনের দিকে কোন মনোযোগ না দেখে। ছাদের চিলেকোঠায় বই এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে একা থাকতেন তিনি।

গানের সময়ে বীভৎসতা তাঁর ক্ষুণ্ণ হ'ত যেন। বিষাদ কোমল করে তুলত কঠিন ভাব, হতাশা কণ্ঠে প্রকাশ পেয়ে জীবনের ব্যর্থতা স্মরণ করিয়ে দিত। ক্ষণকাল তিনি হ'তেন সুর-দেবতা। দেহকে অতিক্রম করে আবেগ উঠত তাঁর গোপন বেদনা থেকে। যে বেদনা শাশ্বত পুরুষচিত্তের চিরক্রন্দন। সে আবেগ প্যাশন।

আবার একে ভালবেসে ফেলল রূপালী অন্ধ শ্রদ্ধায়। কলেজ বন্ধ, প্রফেসর চৌধুরী দূরে, মোহিত চলে গেছে। সন্ধ্যা কাটে না। এ যে তার নেশা। প্রথমে নেশার তৃপ্তির জন্য মনে ঘোর লাগল, তারপরে সত্যই তার নেশা জমল। রঞ্জন রায়ের নীরবতা কৌতূহল জাগাল। বিফল জীবনকাহিনী

করুণার উদ্রেক করল। অন্য পুরুষের মত তিনি তার কাছে ধরা দিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলেন না। তাই বুঝি দৈহিক দৈন্য প্রেমকে আঘাত করতে পারল না অন্তরের দৈন্যের প্রমাণ না পেয়ে। করুণায় হ'ল এ প্রেমের জন্ম, তাই নিতে এ চাইল না কিছু, দিয়েই গেল।

সামান্য রৌপ্যমুদ্রা মাসের শেষে দেওয়া! কি লজ্জা! যাকে সমস্ত দিলেও যার প্রতিভার ঠিক মূল্য দেওয়া হয় না, সামান্য কয়েকটি মুদ্রা তাকে দিয়ে অপমান করা! আর কয়টী ছাত্রছাত্রী আছে ওঁর? তারা কত দেয়? তাতে কি ওঁর প্রয়োজন মেটে? আহা, না জানি কত কষ্ট হয়! জুতোটা তো ছিঁড়ে গেছে।

দৈহিক সৌন্দর্য্যে পক্ষপাত দেখাত রূপালী, কারণ, সে ছিল স্বভাবে গ্রীক—সৌন্দর্য্যপিপাসু। কিন্তু দৈহিক অসামঞ্জস্যও তাকে বহুবার কাছে টেনেছে। সে চাইত ব্যক্তিত্ব, যা মানুষকে সহস্রের মধ্য থেকে স্বতন্ত্র করে দেখায়। সৌন্দর্য্য তাকে আকৃষ্ট করেছে সত্য। সৌন্দর্য্যও তো এক রকম ব্যক্তিত্ব-বিকাশ।

জান তুমি রূপালী, তোমার আমার মত মানুষ কি খুঁজে বেড়ায়? সকলের মুখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে জনারণ্যে কার অন্বেষণ করি আমরা? আমরা খুঁজি প্রতিভা। খুঁজি ভস্মস্তূপে প্রচ্ছন্ন বহ্নি, যার স্পর্শমাত্রেই আমরা জ্বলে উঠব সহস্র সূর্য্যের ঔজ্জ্বল্যে। কত ভুল হয়! সাধারণের কোন ব্যতিক্রম পেলেই ভাবি পেলাম এতদিনে। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।'

এ সন্ধান কোন যুগে শেষ হয় না। অথচ এর বিরাম নেই। ব্যক্তিত্ব চায় ব্যক্তিত্ব। প্রতিভা খোঁজে প্রতিভা। তোমার প্রতিভা নেই, রূপালী? প্রেম যে সবচেয়ে বড় প্রতিভা!

নীল আলো জ্বল্‌ছে ঘরে। ফরাসের ওপর বাদ্যযন্ত্র, রঞ্জন রায় গান করছেন। রূপালী শুনে যাচ্ছে শিখে নেবার প্রচেষ্টায়।

জানালা দিয়ে রাস্তার একাংশ দেখা যাচ্ছে দোতলার ঘর থেকে। জনাকীর্ণ রাস্তা 'হ্যাপিবয়' শব্দে মুখর। বাসন্তী শাড়ী রূপালীর, বেণীতে জরির ফুল। আর সমস্ত চেতনা করুণ ইমন-আলাপে মগ্ন হয়ে গেছে।

কিন্তু, কালবৈশাখী মুক্ত হ'ল গগনপ্রান্তে। সমস্ত আকাশ নিবিড় মেঘপ্রলেপে নিশ্চিহ্ন হ'ল, উত্তাল বাতাস দুয়ারে দুয়ারে আঘাত করে গেল। মুক্তাধারার মত বৃষ্টি পড়তে লাগল লাল রাস্তায়। জনশূন্য রাস্তা এক নিমেষে, কেবল বৃষ্টি আর ঝড়। তোলপাড় হচ্ছে সারা আকাশ। অলকানন্দার বোধ হয় বাঁধ ভেঙে গেছে। স্বর্গকে সিক্ত করে বারিপাতে পৃথিবীকে ডুবিয়ে মারতে চায়।

ইমন আলাপ বন্ধ করে রঞ্জন রায় তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে। খোলা জানালা রূপালী বন্ধ করতে উঠলে বাধা দিলেন—থাক খোলা। সভয়ে রূপালী জানালার সামনের কি কিছু কিছু জিনিষপত্র সরিয়ে রাখল। জলের ছাঁটে পাথরের মেজে ভিজে গেল। রঞ্জন রায়ের পীত চা-পাত্রে জল জমে রইল। কিছু বলতে সাহস করল না রূপালী, রঞ্জন রায়ও অনেকক্ষণ কথা বললেন না। সহসা বাজনাটা টেনে গান ধরলেন—

"কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো।

* * *

বেদনাদূতী গাহিছে 'ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।

*　　　*　　　*

দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।'

*　　　*　　　*

গগনতল গিয়েছে মেঘ ভরি
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।
　　এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
　　পরাণ মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল জল পড়িছে ঝরি ঝরি।

*　　　*　　　*

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া,
সময় গেলে হবে না যাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষ-ঘন কালো
পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো।"

—রবীন্দ্রনাথ

অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আকুল সুর কেঁদে ফিরতে লাগল। সহসা মনে হ'ল রূপালীর সম্মুখ দিয়ে খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী বয়ে যাচ্ছে। তটভূমি উপলবিস্তৃত। ফুল ফুটে আছে ইতস্ততঃ। অদ্ভুত সে সব ফুল। আগে সে দেখেনি কখন। আরও দূরে ধূসর পাহাড়, শুভ্র মেঘে তার চূড়া ঠেকেছে। স্বচ্ছ একটি আলো সেখান থেকে ভেসে আসছে ঈথারের স্রোতে। বড়

একটা প্রস্তরে কে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে? তার বাঁশীর সুরে নানা পশুপক্ষী মন্ত্রমুগ্ধ দাঁড়িয়ে। পশ্চাতে উঁকি দিচ্ছে পরীরা ডানার আড়ালে মুখ লুকিয়ে। নদী থেকে জলকন্যা মাথা তুলেছে। কার এমন আশ্চর্য্য সুর! মনের দ্বারে কার সুর আকুল প্রার্থনা জানায়?

ভাল করে দেখতে যেয়ে রূপালী ভয় পেল। কী বীভৎস মূর্ত্তি এর! মাথায় শিঙ, পায়ে ছাগক্ষুর, অর্দ্ধদেহ পশুর। জলকন্যা পলায়ন করল তার মূর্ত্তি ভাল করে দেখে। এ তো প্যান আদি সুরস্রষ্টা। এ নিঃসঙ্গ, নারী একে চায় না। দূর থেকে পরীরা বলে উঠল, রূপালী যেন স্বপ্নঘোরে শুনল—

"Sweet, sweet, sweet, O Pan!
Piercing sweet by the river!
Blinding sweet, O great god Pan!—"

কিন্তু তারাও রইল না। অন্ধকার ঘিরে ফেলল প্যানের মূর্ত্তি। প্রস্তরে সমাসীন চির একাকী দেবতা।

চমক ভেঙে রূপালী চেয়ে দেখল রঞ্জন রায়ের মুখ তারই দিকে ফেরান। চেয়ে আছেন তিনি তার দিকে কি না বোঝা যায় না চোখের তারার দোষে। কিন্তু উজ্জ্বল তাঁর দৃষ্টি। প্রদীপ্ত চোখে সুরের অগ্নি জ্বলে উঠেছে। বিহ্বল ভাবে রূপালী বলল, আপনি? আপনি কি?

জীবনে প্রথম রঞ্জন রায় একটু হাসলেন। সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, এ গানটা তুমি শিখতে চাও?

সেই প্রায়ান্ধকার গৃহকোণে সেদিন রূপালী কি অভিজ্ঞতা লাভ করল? ক্ষণকালের জন্য জন্মান্তরের সামান্য আভাস-সঙ্কুল সেই সন্ধ্যা জীবনে তার অক্ষয় হয়ে রইল।

কলেজ খুলে গেল, পরীক্ষা এল রূপালীর অত্যন্ত এগিয়ে। লজিক ভিন্ন পড়ার বই বিশেষ কিছু সে পড়েনি। পড়াশোনায় ক্ষতি হবে বলে অভিভাবকেরা তার গান শেখা বন্ধ করে দিলেন। কিছুদিন মন খারাপ হ'ল তার। কিন্তু নূতন জনসমাগমের ভিড়ে রঞ্জন রায় কোথায় তলিয়ে গেলেন তার দ্রুতগতিশীল মনে।

অনেকদিন পরে মনে হ'ল। কয়েক বছর পরে রঞ্জন রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ছোটভাই বাক্সে বন্ধ একখানা পুরোনো বেহালা পৌঁছে দিলেন—এটা আপনাকে দিতে বলে গেছেন দাদা। সমস্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে তাঁর আপনাকে পছন্দ ছিল।

কোথাও কোন নির্দ্দেশ নেই। একটুকরো কাগজে পর্য্যন্ত কোন কথা লিখে মনের কণামাত্র প্রকাশ করে রেখে যাননি এই মৌনী-লোকটি। বেহালাটি হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল রূপালী। সেই বর্ষণ-মত্ত সন্ধ্যা! সেই চির নিঃসঙ্গ সুরদেবতা প্যান!

দিন চলে যেতে লাগল জলের বেগে। সেই রকম বেগে অসংখ্য প্রেম এল, গেল। সবাইকে মনে রইল রূপালীর, কিন্তু কেউ চিহ্ন রাখতে পারল না। কত প্রেম! একঘণ্টার, এক-দিনের, একমাসের, এক বৎসরের। কখন আলাপের মধ্য দিয়ে অনুরাগ ব্যক্ত হ'ত পুরুষের, কখন বা দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখে খবর মিলত। কখন বা দৃষ্টিতে অথবা ব্যবহারে প্রকাশ পেয়ে ক্ষান্ত হ'ত। অনেকের চিত্তে বিদারণ রেখা রেখেছে রূপালী। তার কাছে এলে, তার সঙ্গে মিশলে তাকে ভালবাসা যেন পুরুষের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ সত্য ছিল। সে গড্ডালিকা-প্রবাহ প্রেমের সম্যক তালিকা আমার জানা নেই। রূপালীও সঠিক বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। 'আরব্য উপন্যাসের' অঙ্গুরীর মাল্য গণনা নির্ভুল রাখতে পারত।

বাহিরের জীবনে কোনও বাধা এল না রূপালীর। প্রেম আর তাকে অন্তর্মুখী করেনি বহুদিন, শুধু তার দেহ রূপ, চিত্তে সুখ জাগিয়েছে। প্রেম ভিন্ন দিন তার শূন্য লাগত, তাই এ ছিল তার বিলাস এবং প্রয়োজন।

তখন কিছুদিন পুরুষকে যেন অন্য চক্ষে দেখতে পারত না রূপালী? কারও দিকে তাকালেই তার প্রেমজীবনের কথা স্বতঃই রূপালীর মনে ভেসে আসত। হাত, পা, অধর সব কিছুর যেন অন্য মানে ছিল। প্রায় সব যুবককেই তার দেখতে ভাল লাগত। পৃথিবী কি অদ্ভুত সুন্দর! সূর্য্যের আলোয় জীবনউল্লাস ছড়িয়ে পড়ছে। বাতাসে যৌবনের গান! নীল আকাশ নীচে তাকিয়ে হাসছে। সর্ব্বত্র গাছপালা, পুষ্পপল্লব ব্যেপে কিসের মন্ত্রণা চলছে! সকলেই যেন তাকে সুখ দেবার জন্য প্রস্তুত। সম্মুখে যে পুরুষ আসছে সে-ই সুন্দর, তার-ই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। তাকেই বুঝি সে এতদিন খুঁজে এসেছে! কোন তরুণ-যুবক বিবাহিত শুনলে রূপালী ঈষৎ নিরাশ হ'ত। মনে হ'ত তার একটিও বা কমে যাবে কেন তার আয়ত্ত থেকে। বিবাহিত পুরুষ যে অন্যের সম্পত্তি, তাতে অন্যের ছাপমার্কা রয়েছে। ছিঃ, অন্যের ব্যবহৃত, পুরোনো দ্রব্যে হাত দেওয়া যায় না। তাতে অন্য নারীর উপর অবিচার হয়। কিন্তু জাতকুল সম্বন্ধে চিন্তার অবকাশ ছিল না রূপালীর, কারণ সে তো বিবাহ চাইত না।

এই সময়ে অনেক ব্যক্তি রূপালীকে বিবাহ করতে চেয়েছিল ক্রমাগত। কিন্তু, তার অভিভাবকেরা তার বিলম্বে বিবাহ দিতে মনস্থ করেছিলেন। তাছাড়া রূপালী নিজের ঘোর আপত্তি স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল। একমেয়ে মাত্র বলে তাড়াও

ছিল না কিছু। সকলে তাকে অত্যন্ত ভালবাসত, তার মতের প্রাধান্য ছিল সকলের কাছে।

যদিও প্রতিবার আমি রূপালীর বিবাহবিতৃষ্ণার পক্ষ নিয়ে তার পরিজনদের সঙ্গে তর্ক করে যেতাম, মাঝে মাঝে আমারও মনে হ'ত এমন স্বভাবের মেয়ের জোর করে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। মুক্ত মন তার একদিকে আটকে পড়ত, চতুর্দ্দিকে প্রজাপতিপনায় বিচরণ করতে পারত না। হয়তো সে তাহ'লে জীবনে সুখী হ'ত। বন্ধন ছিল তার প্রয়োজন।

কত প্রেম। বয়স্ক, পিতার বন্ধুকে পর্য্যন্ত বাদ দেয়নি তার মন। শশাঙ্ক চন্দ ছিলেন পিতার বড় গ্রাহক। তাঁর মিনার্ভা গাড়ীতে তাঁর পাশে বহুদিন বেড়িয়েছে রূপালী। যৌবন অতিক্রম করলেও যৌবনের বাঁধন ছিল চন্দের দীর্ঘ, সবল দেহে। মনে মনে কতদিন রূপালী কল্পনা করেছে—প্রকাণ্ড বাড়ীতে লাল মখমলের কাউচে সে অর্দ্ধশায়িতা। পায়ের কাছে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন চন্দ অনুগত প্রেমিকের সাধনায়। এমনি কত টুকরো টুকরো চিত্র। সেগুলো অবশ্য কখন বাস্তবে পরিণত হয়নি। কারণ চন্দের ছিল কলহপ্রিয়া পত্নী গৃহে, জীবনে কখনও তিনি অবিশ্বাসী হ'বার চিন্তা করেন নি। আর তাছাড়া রূপালী ছিল তাঁর মেয়ের বয়সী। তাকে নিয়ে বেড়াতে বের হ'লে সকলে তাকে তাঁর মেয়ে বলে ধরে নিত। কাজেই, মাঝে মাঝে পিঠ চাপড়ে আদর দেখিয়ে, ফুল ও চকোলেটের বাক্স কিনে কিনে দিয়ে স্নেহ দেখিয়েই তিনি ক্ষান্ত হতেন। রূপালী অবশ্য বুঝে নিয়েছিল পিতৃপ্রতিম পিতৃবন্ধুর স্নেহের মধ্যে অন্য কিছুও ছিল। সে পুরুষের মুখের দিকে না তাকিয়েই তার মন পড়ে ফেলবার ক্ষমতা অর্জ্জন করেছিল। বয়সোচিত গাম্ভীর্য্যে, সংসার সমাজ ধর্ম্ম ইত্যাদির

কথা স্মরণ করে চন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে নিজেকে সংবরণ করে নিতেন। সেই দীর্ঘনিশ্বাসে রূপালী নিজের জয়গীতি শুনতে পেয়ে সন্তুষ্ট ছিল। গণ্যমান্য এক ক্রোড়পতির চিত্ত তার মত অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের জন্য অশান্ত—এই তো তার গৌরব।

কিছুদিন পূর্ব্বে রূপালীর বাবা গাড়ী কিনেছিলেন। বারে বারে ড্রাইভার বদল করে করে অবশেষে একটি শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানকে পেলেন। মন্মথ দায়ে পড়ে চাকরী নিয়েছিল। বড় ভাইএর অসুখে তাকে চেঞ্জে পাঠাতে হয়েছে মা'কে দিয়ে। বড় ভাইয়ের চাকুরী গেছে। বৌদি ছোট দেওর আর নিজের মেয়েটিকে নিয়ে দেশের বাড়ীতে আছেন। সামান্য জমি জমার আয়ে চলে না সংসার। কলেজ ছেড়ে তাই অনেক খোঁজাখুঁজির পর এই চাকুরী পেয়েছে মন্মথ। তাদের গ্রামের জমিদারদের গাড়ী সখ করে চালিয়ে শিক্ষা তার ভালই ছিল।

আহা ভদ্রলোকের ছেলে পেটের দায়ে এই কাজটা নিয়েছে। কপাল বেচারীর! দেখিস রুলি, 'আপনি' করে কথা বলিস যেন। রূপেন, খবর্দ্দার কখনও ওর সামনে ওকে ড্রাইভার বলবে না। মা নানাবিধ শিক্ষা দিতেন। সকালে বিকালে উপস্থিত থাকলে মন্মথকে চা-বিস্কুট পাঠাতেন চাকরের হাতে।

সুদর্শন তরুণ যুবক। বলতে গেলে সে-ও তার মনিব। নতনেত্রে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে, আদেশ কিছু করলে তৎপর হয়। মন জোগাবার চেষ্টা করে নীরবে। মুখ তুলে চোখের দিকে তাকাবার সাহস নেই, তার আবার অন্যকথা! এ এক নূতন সংস্থান! এ পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তেজনাকারক লাগল রূপালীর!

গাড়ী চালিয়ে যেত মন্মথ, পিছনে কাল, ঘনচুল তোলা! দীর্ঘ

গ্রীবার ওপরে শার্টের খাড়া কলার। ঘোর দারিদ্র্যে পতিত হলেও বেশভূষা ছিল তার পরিচ্ছন্ন। সপ্রতিভ, চটপটে ভাবভঙ্গি। নিজের দীনতায় যদিও সে প্রায়ই বিষণ্ণ হয়ে থাকত!

গাড়ীর নরম গদিতে হেলান দিয়ে রূপালী বক্রদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করত। এখনি তার একটি কথায় গাড়ী বন্ধ হ'বে। লম্বা আঙ্গুলগুলি শক্ত করে ষ্টীয়ারিং ধরে আছে—সে আঙ্গুল নিশ্চেষ্ট হ'তে পারে তার সামান্য ইচ্ছায়! যে লোক এত বড় ছয় সিলিণ্ডারের গাড়ীখানা অনায়াসে খেলাচ্ছলে চৌরঙ্গির জনতা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তাকে কলেজে পৌঁছাতে, সে অখণ্ড শক্তিমান যান্ত্রিক তার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।

চেয়ে চেয়ে রূপালী ভাবত—মনের মধ্যে সর্ব্বজাগরূক বিষাদ বুঝি একে রহস্যময় করেছে। ভাগ্য একে বঞ্চনা করেছে—তাই দুঃখবহন করবার অসামান্যতায় এ স্বতন্ত্র সাধারণের থেকে। কলেজ ছাড়তে হয়েছে—সে ক্ষোভ হয়ত নীরবে এ বহন করে যাচ্ছে যেমন নীরবে গাড়ীর গীয়ার বদল করে যাচ্ছে। ভৃত্য এ, বেতনভুক ভৃত্য মাত্র, যদিও ভদ্রঘরের যুবক। ড্রাইভার-শ্রেণীর সঙ্গে এর কতটা প্রভেদ সেটা দেখলেই বোঝা যায়। তবু ভৃত্যের সঙ্গে প্রেম? হায়! হায়! রূপালী বিদ্রূপের হাসি হাসত, তার এখনও অত দুর্দ্দশা হয়নি।

তবু দিনে রোমাঞ্চ এল নূতন। প্রফেসর চৌধুরীর ক্লাস কমে সপ্তাহে একদিনে দাঁড়িয়েছে মাত্র। তাঁর আকর্ষণ যেন কমে এসেছে। দুইবছরে ভদ্রলোক একেবারে বুড়ো হয়ে গেছেন! নানা পারিবারিক দুর্ঘটনা ও শারীরিক অসুস্থতায় দেহ তাঁর জরাগ্রস্থ হয়ে আসছে। অমন সৌন্দর্য্য রাহুর স্পর্শে মলিন।

আর রূপালীর দেহে যৌবনের বন্যা নবাগত। এখানেই যৌবনের কাছে বয়সের পরাজয়।

নিত্য নবসজ্জা করতে লাগল রূপালী। সে লক্ষ্য করেছিল মুখ তুলে তার দিকে না তাকালেও মন্মথ অনিমেষে তাকে লক্ষ্য করে। স্থির প্রতীক্ষা তার দেহের ইঙ্গিতে। বীণার তারে আঘাত দিলে সুর তো বেজে উঠবেই।

একটু আগে গাড়ীর কাছে দাঁড়াত যেয়ে রূপালী। উদ্দেশ্য যেন ভাইদের এসে ওঠবার প্রতীক্ষা। অভিপ্রায়, গাড়ীর চালককে বেশভূষা দেখান। কলেজ থেকে ফিরবার মুখে গাড়ীর পা-দানীতে এক পা রেখে গাড়ীর হাতল ধরে বন্ধুদের সঙ্গে সে কি গল্প তার! দারিদ্র্য-বিদ্ধ যুবককে অনর্থক বিদ্ধ করে তার নিষ্ঠুর খেলা চলত।

গ্রামের ছেলে, মফঃস্বল কলেজে সামান্য কিছুদিন পড়াশোনা করেছে। রূপালীর মত মেয়ে পৃথিবীতে আছে এ ছিল তার স্বপ্নের অগোচর। নিত্য নূতন লীলাবিভ্রমে সে মেয়ের তরুণ চিত্ত তার অস্থির হয়ে উঠত।

মন্মথের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলতাম আমি। মন্মথ আমাকে বলেছিল, সময় নেই মোটে, নইলে দু'একটা স্কুলের ছেলের ট্যুইশন পেলে করতাম। এ চাকরিতে অবশ্য একশো করে পাই। অন্য কোথাও আমার মত লোকের এ মাইনে পাওয়া দায়। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে এই কাজে বড় অপমান হয়। দাদা যদি ভাল হয়ে চাকরি করতে পারে, আবার পড়ে পরীক্ষাটা দিই। আমায় দিকে চেয়ে একটু লজ্জার হাসি হেসে বলেছিল, বইগুলো সব এনেছি সঙ্গে। সময় পেলেই পড়াশোনা করি।

দেখেছিলাম সেদিন তার মুখচোখে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হবে এই ছিল তার পণ। অন্য কিছুতে সে মন দেবে না। মাথা নীচু করে অন্ধকার ঘরে পাঠ্য বই পড়ে যাচ্ছে, সেই তার সোনার বড়্‌শি। তাই দিয়ে সে ভাগ্যকে টেনে তুলবে।

হায় তরুণ! বৃথা তোমার আকাশকুসুম রচনা। তোমার প্রতি রূপালীর চঞ্চল কটাক্ষ আমি লক্ষ্য করেছিলাম। দেখে-ছিলাম তোমাকে দেখলে তার সহসা প্রগলভতা। অন্য কিছুতে তুমি মন দেবে না? অসম্ভব।

তাকে বলেছিলাম তার ভালোর জন্য, এ চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরি নাও না কেন তুমি?

বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে মন্মথ বলল, আর কিছু পেলাম না বলেই তো এই চাকরি নিলাম। আমাকে কে চাকরি দেবেন বলুন? বাবু বলেছেন তিনি খোঁজ করবেন, ভাল কিছু পেলেই দেবেন। বাবুর এখানে থাকতে আমার কোন লজ্জা নেই। বাবু, মা আমার সঙ্গে বাড়ীর লোকের মতই ব্যবহার করেন। আর একটু থেমে, কপোল রঞ্জিত করে—বাবুর ছেলেমেয়েরাও খুবই ভাল।

বাবুর মেয়ে খুবই ভাল। আর একটু কম ভাল হ'লে তুমি বেঁচে যেতে মন্মথ। তোমার ভাঙা ভিটেতে আজ চালা-ঘর উঠত, মায়ের মুখে হাসি ফুটত। সওদাগরী অফিসে দশটা-পাঁচটা করে দেড়হাজার যৌতুক সমেত কোন ষ্টেশন-মাষ্টারের 'রয়েল রীড়ার'-পড়া মেয়েকে বিবাহ করে পুত্রকলত্র পরিবেষ্টিত হয়ে তোমার সুখের জীবন কাটত। যে অগ্নি তোমাকে আকর্ষণ করেছিল, তাতে নিজেকে দগ্ধ করে তোমার আত্মাহুতি দিতে হ'ত না।

অহরহ তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে লাগল রূপালী সবেগে। বন্ধুদের মাঝে মাঝে কলেজ থেকে বাড়ী নামিয়ে দিয়ে ফিরত সে। পেছনের আসন ভর্ত্তি করে দিয়ে সামনে সে বসত মন্মথের পাশে। গাড়ীর দোলাতে ইচ্ছা করে গায়ে হেলে পড়ত। তার স্পর্শভীরুত্ব মোহিত নষ্ট করে গিয়েছিল। পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে রসালাপ করত—উত্তপ্ত নিশ্বাস ঘাড়ে লাগত মন্মথের, আঁচল উড়ে বাহু স্পর্শ করে যেত। উন্নত বক্ষের আভাষ স্পষ্ট হয়ে উঠত বসন সরে। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন হয়ে মন্মথের গাড়ী চালাতে হ'ত। সেদিন আর বাড়ী ফিরে পাঠ্য বই নাড়া-চাড়া করা যেত না। মলিন শয্যায় শুয়ে মন্মথ আকাশপাতাল ভেবে কুলকিনারা পেত না।

রূপালী ধনীকন্যা বিদুষী, রূপসী। তাকে কামনা করা তার পক্ষে পাপ। কিন্তু মনকে উচিত-অনুচিতের সীমারেখায় বাঁধা যায় না। মনে কামনা এল।

রজনী নিদ্রাহীন হ'ল মন্মথের। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দেখা দিল। বর্ণ হ'ল পাণ্ডু, দেহ শীর্ণ, চোখের দৃষ্টি তীব্র। রূপালী তাকে নিয়ে দোকানহাটে বেড়াতে লাগল। নিউ মার্কেটের সামনে গাড়ী থামিয়ে আদেশ করত,—এঞ্জিনে চাবি দিয়ে আমার সঙ্গে আসুন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মন্মথ তাকে অনুসরণ করত নীরবে সেই রং আর আলোর মেলাতে। পুষ্পসারের শিশি ক্রমান্বয়ে তার নাকের কাছে ধরত রূপালী—দেখুন না এইটে ভাল, না আগের-টা ?

চকিত হরিণ-দৃষ্টিতে রূপালীর আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে অত্যন্ত সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে মন্মথ উত্তর দিত, আগের-টাই তো ভাল লাগল আমার কাছে।

ড্রাইভারের সঙ্গে প্রেম করছে সে, একথা রূপালী কখনও

মনে আমল দিত না। একটু মজা হচ্ছে, এতে কারও কোন ক্ষতি হচ্ছে না। তার প্রকৃতি নিষ্ঠুর ছিল না, ছিল লঘু, দায়িত্বজ্ঞানশূন্য।

মন্মথ বেশভূষায় আরও মনোনিবেশ করল। নিত্য রূপের হাটে আনাগোনা করতে করতে মনেও তার রং ধরল। একশিশি পুষ্পসার কিনে ফেলল। গায়ে একটা রেশমের জামা না থাকলে চলে না, তা হ'ক না কেন দর্জ্জির দোকানে বিল বাকী। মনের অতিচাঞ্চল্যে কখনও ছায়াছবি দেখতে ছুটে যেতে হ'ত; মেসে থাকতে পারত না। অবশ্য ফিরে এসে চাঞ্চল্য বাড়ত ছাড়া কমত না। আয়নার সামনে চুলের বাহারে সময় লাগতে লাগল অনেক। কোথায় বা গেল তার পড়া, কোথাও বা পরিজনদের দুঃখমোচনের উদ্যম? চাকরী খোঁজাও মাথায় উঠল। সর্ব্বদা এক চিন্তা। কাউকে কিছু বলতেও সে পারে না, আভাসে মনের কথা জানাতেও পারে না। কেবল অন্তর্গূঢ় চাঞ্চল্যে আর কামনায় ছট্‌ফট্ করে মরে। ক্রমেই পতন হ'তে লাগল তার—অবশেষে পতিতার গৃহ। উর্দ্ধ তারাকে চেয়ে কত জোনাকীর এমনি অপমৃত্যু হয়।

মিষ্টার লাহিড়ী তার ব্যবহারে বিরক্ত হলেন। হাত তার ঠিক থাকে না। কতবার দুর্ঘটনা করতে করতে বেঁচে যাচ্ছে। জনতার মধ্য দিয়ে গাড়ী চালাতে থতমত খেয়ে যায়। সর্ব্বকাজে অমনোযোগী, নিজের ওপর যেন তার কোন শক্তি নেই।

ক্রমে ক্রমে হাজিরার সময়ে দেরী হতে লাগল। বেশভূষা উচ্ছৃঙ্খল, অনাচারের চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে। সাবধান করে করে কোন ফল পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে রূপালীর বাবা মন্মথকে বরখাস্ত করলেন।

মা কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, ওগো, গরীবের ছেলের কি হবে?

রূপালীর বাবা ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর দিলেন, ইচ্ছা করে কি ছাড়ালাম ? কাল দেখলে তো কাণ্ড ? একেবারে বদমাইস হয়ে গেছে। তবে নন্দীসাহেবকে বলে তাঁর চূণের দোকানে কাজ দিয়েছি। লরী চালাতে হবে। সময় কম পাবে হাতে। কড়া লোকের কাছে ঠিক থাকবে। ওর গাড়ীতে চড়াও আমাদের নিরাপদ ছিল না।

রূপালী শুনে ঘৃণায় শিহরিত হ'ল। সৎছেলে, ভদ্রলোক বলে দয়া করে ভাল ব্যবহার সে করেছে। ভেতরে এত কালি! বাবা ওকে তাড়িয়ে অন্যত্র দিয়ে ভাল করেছেন। একা ওর সঙ্গে গাড়ীতে বেড়াত। কি কখন করে বসত ঠিক কি ?

মাঝে মাঝে উদ্ভ্রান্ত চিত্তে রূপালীদের বাড়ী তার বাবার সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশে আসত মন্মথ। দৃষ্টি খুঁজত তার কিন্তু রূপালীকে। চরিত্রহীনতার কলঙ্কে সে তখন রূপালীর কাছে অস্পৃশ্য। একদা মন্মথের ভিক্ষার্থী দৃষ্টি দোতালার গাড়ীবারান্দায় দণ্ডায়মানা তার দৃষ্টিতে মিলেছিল। ঘৃণার সহিত মুখ ফিরিয়ে নীরব ধিক্কারে তাকে দগ্ধ করে দিয়ে রূপালী ঘরে ঢুকে গেল।

কিছুদিন পরে সংবাদপত্রে জানা গেল ঢাকুরিয়া লাইনে রেললাইনের নীচে মন্মথ মাথা পেতে দিয়েছে। বাজারে অপরিসীম দেনা ও চরিত্রহীনতা এ ব্যবহারের কারণ বলে স্থিরীকৃত হ'ল। আমি কিন্তু জানি, আত্মহত্যার মূল কারণ রূপালী।

কোমল তোমার মন রূপালী। অনেক পরিচয় পেয়েছি তোমার করুণার। কিন্তু আজ এই আলোর নীচে বসে জীবন-কাহিনীর পটে একবারও তো মন্মথের তরুণ মুখচ্ছবি ভেসে

আসছে না তোমার চোখের সামনে? চরিত্রহীন লম্পটের জন্য কখনও তুমি শোচনা করনি। সহস্রকে নিয়ে খেলা করতে তুমি। দেহ ছিল পবিত্র, কিন্তু মন? তাতেও কি দাগ পড়েনি রূপালী? অথচ চাইতে তুমি নিষ্পাপ, নির্ম্মল নব নাগর প্রতিবারেই। নৈতিক চরিত্রের অত্যন্ত মূল্য দিতে কেন? ভালবাসার ক্ষমতার আর নৈতিক চরিত্রের সংযোগ অতি ক্ষীণ। কখনও সে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েও যায়।

দেহ পবিত্র না থাকলেও মনের ক্ষতি হয় না। প্রেম তো মনেরও জিনিষ, দেহ তার প্রকাশের একটা বাহন মাত্র। যে ব্যক্তির একনিষ্ঠতা নেই, যার শরীর বহুবল্লভ, তাকে ঘৃণা করেছিলে কেন? এটা কি ঈর্ষা নয়? মন্মথের পরিণাম শুনে প্রথম কথা তুমি ভাবলে—একে আমি বিন্দুমাত্র মনোযোগের যোগ্য ভেবেছিলাম! তার চরিত্রহীনতার জন্য দায়ী কে? তুমি। তুমি, যার সতীত্ব চিরদিন অটুট ছিল। তুমি যদি অসতী হ'তে রূপালী, তাহ'লে মন্মথের আত্মহত্যা করতে হ'ত না। তার মত পুরুষ মানসিক বিলাস নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে না। তার প্রতিভা নেই, তোমার প্রেমিক মনেরও তার অভাব ছিল।

নিষ্ঠুর! তোমার নিষ্ঠুরতার অনেক নিদর্শন পেয়েছি। আজ যৌবন অবসানে সেই ছেলেটির কথা মনে পড়ছে না তোমার? সেই কাল, দীর্ঘাকৃতি যুবকটি? কি নাম তার? সেই যে অতি শীর্ণ চেহারার ওপরে ধ্যানী বুদ্ধের মত নির্লিপ্ত মুখ প্রশান্ত? শ্রীকুমার ছিল না তার নাম? জাষ্টিস্ মিহির বাগ্‌চীর ছেলে? তুমি এঞ্জিনীয়ার লোক ভালবাস শুনে দুর্ব্বল, রুগ্ন ছেলেটি বাবার সঙ্গে বিবাদ করে শিবপুরে ভর্ত্তি হয়েছিল। দেখতে তুমি তাকে পারতে না—চোখেমুখে তার

বুভুক্ষা মাখান ছিল। শীর্ণ দেহ অস্বাভাবিকতায় রুগ্ন। বাহিরের বসবার ঘরে থেকে সে ওপরে তোমার কাছে নামলেখা কার্ড পাঠিয়েছিল! তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চীৎকার করে চাকরকে রুক্ষ স্বরে তুমি বলেছিলে, আমি শুনেছি—বোল্ দেও মিস্‌সাহাব বাহার গয়ী।

তোমাকে পুরুষ বিরক্ত করত, জানি। সকলকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, মানি। অনেককে অপমানিত করেও অন্যায় করনি। কিন্তু বিনা দোষেও বহুকে শাস্তি দিয়েছ। সকলকেই বুঝে দেখার অবকাশ হয়নি তোমার। যৌবনের তাড়নায় খেলাও করেছ বিস্তর। কারও ওপরে বিদ্রূপ হ'লে তারও যে হৃদয় আছে, সে কথা ভুলে যেতে তুমি। নেমেসিস্ তাই অলঙ্ঘ্য।

ভগবান, মুক্তি দাও! মুক্তি দাও! এ জীবন আর সহ্য করতে পারি না। স্নানের ঘরে জলের টাবে কার অশ্রু সুরভিত জলে মিশছে? শুভ্র নগ্নতনু ক্রীড়ামত্ত মরালের লীলায় জলমগ্ন। কাল চুল সাবানের ফেনমণ্ডিত; শুভ্র তরঙ্গের শোভায় মাথার ওপরে অকুঞ্চিত।

ওঃ, কি কষ্ট পেয়েছি তখন! সে দিনগুলি কি ভীষণ কেটেছে! রূপালী ভাবছে আলোর নীচে গদিদেওয়া আসনে বসে।

Anything is better than this life. Oh I die, I die! উঠে দাঁড়াল উত্তেজিতা স্নানের টাব থেকে শাদা টালির মেজেতে। সাবান-মণ্ডিত চুলের রাশি মাথার ওপরে শুভ্র ফেনশীর্ষে অযুত বিষধরের ভীষণতায় দুলছে। কাল চোখে মত্ততা! রক্তিম অধর দশনে পিষ্ট।

কে এই ছবি? ক্ষীণ কটি নগ্ন, নগ্ন মর্ম্মরদৃঢ় উরু। বক্ষ

কঠিন শিলার মত, নগ্ন। দেহ তার রক্তমাংসের শরীর নয়—তরবারী। উজ্জ্বল দীপ্তিতে ঝলসিত প্রেমে, কামনায়। উত্তেজনায় কম্পিত তনু। আহা! সুন্দর ছবি সেই পঞ্চবিংশতির রূপালী। কিন্তু, বড় কষ্ট পেয়েছিল সে।

টেবিলের ওপরে ইলেক্‌ট্রিক পিলসুজে জ্বলছে প্রদীপ শাদা ঝালর দেওয়া নীল ঢাকনীর তলায়। জানালার সামনে টেবিল বাঁহাতে উত্তপ্ত চায়ের পাত্র, ডানহাতে শেয়াফার নীল-সবুজ ডোরাটানা কলম। ঝড়ের বেগে সে কলম চলছে হংসপক্ষশুভ্র কাগজের উপরে। কবিতা লিখে যাচ্ছে চতুর্বিংশতির রূপালী। অদ্ভুত সে কবিতা।

চল্লিশের রূপালী এতক্ষণে একটু উত্তেজিতা হ'ল সেদিনের মত্ততার কথা স্মরণ করে। সে মত্ততা তার সমগ্র দেহমনকে আশ্রয় করেছিল। প্রকাশ তার কাম্য। প্রকাশের পাত্র কাছে সর্ব্বদা থাকত না। তাই বুঝি সে প্রাবল্য কবিতায় একান্তভাবে ভেঙ্গে পড়ত। গান যদি সে গাইত তখন, বন্যতা আসত সে সঙ্গীতে। দুই হাতে শাদা চাবীর অর্গানে ভাঙা-ভাঙা সুরতালে সঙ্গীত সৃষ্টি করছে সে নীচু আসনটাতে বসে। মাথা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, একাগ্র। সহসা স্বর মিশল—উগ্র সুমিষ্ট স্বর। গান গাইছে রূপালী, শোন।—

"মাধব, বহুত মিনতি করু তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলু
দয়া নহি ছোড়ব মোয়।"

সে মাধব কোথায়, যে এ আহ্বানের যোগ্য? প্রেম ছিল কাম্য রূপালীর, কিন্তু কেন জানি না চিত্ত উন্মাদ হ'লে তার

কণ্ঠে যে গান আপনি ধরা দিত, সে কোনও প্রেম-সঙ্গীত নয়—সে ঈশ্বর-বন্দনা।

তখন জানি, বিরহে অথবা কামনায় রূপালীর হৃদয় উদগ্র হ'লে সে অনুভূতি এত তীব্র হ'ত যে যার তৃপ্তি কোনও নরদেহীর দ্বারা সম্ভব ছিল না। পৃথিবীকে পশ্চাতে ফেলে সে সুর উঠে যেত আহ্বান-মুখরতায় উর্দ্ধে, যত উর্দ্ধে সে উঠতে পারে।

রূপালী একটু নড়ে-চড়ে বসল। সেদিনের সেই গীতরতা তরুণীকে আজ যেন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ধূসর কাল ছিটবোনা মোজাইকের মেজে, কোণে আলোর নীচে অর্গান্ যন্ত্র। সামনে দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভোরের আলো' চিত্র। সে গানের শেষ হয়েছিল আলিঙ্গনে। পেছন থেকে দৃঢ়, সবল বাহু তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সূক্ষ্ম আদ্দির পাঞ্জাবীর কড়া ইস্ত্রির শব্দ, পায়ে কাল পেটেন্ট্ চামড়ার পাম্পস্, চুলে পোমাড্, হাতের কব্জীতে 'কুইন্ অফ নাইট'। ওই পুষ্পসার ব্যবহার করত সে। ইন্দ্রজিৎ!

তার স্পর্শ দেহের প্রতি অণুতে কামনা জাগরূক ক'রে তুলত রূপালীর। আবার দেহকে জাগিয়েছিল সে উত্তপ্ত স্পর্শবন্যায়। আলোর নীচে রূপালী উল্টে উল্টে শেষের দিকের পাতাগুলি দেখে যেতে লাগল। সেইসব কবিতার কিছু চিহ্ন আছে। ত্রয়োবিংশতির রূপালীর ডাইরিতে কবিতা। তুলে দিচ্ছি।

রূপালীর ডাইরি

'নিরুপায়'

শুধু আছে অনুভূতি, নাই উপাচার,
কামনার হানাহানি চলে ক্ষণে ক্ষণে,
দূরে থাকে সম্ভোগের বস্তু সে আমার,
তাই প্রেমতৃষা মেটে শুধু মনে মনে।

কল্পনার কি বিলাস! শুভ্র শয্যাতলে
সাফোর কবিতা পড়ে কাটাই উন্মনা,
রুদ্ধ বাসনায় চিত্ত অহরহ জ্বলে,
অমৃত দূরেতে সরে—নাহি পাই কণা।
যৌবন দুর্ব্বার বন্ধু, নীতিশাস্ত্র পড়ে
কাটান হয়েছে দায় প্রবাস-যাপন;
উপবাসী দেহ, শোন হাহাকার করে,
মানে না, মানে না সে যে শাসন-বারণ।

তখন কিছুদিন কলিকাতার বাহিরে ছিল সে বড়দিনের সময় ছোটভাই-এর অসুস্থতায়। বিরহ। তীব্রতায় স্বস্তি ছিল না প্রেমে। এক এক সময়ে যেন শারীরিক যন্ত্রণা অনুভূত হ'ত। আর সে সহ্য করতে পারে না। ভারী সীসার মত শরীর হয়ে ওঠে, নির্লিপ্ত জড়তা মন আক্রমণ করে। কিছুতে উৎসাহ নেই! আনন্দ চলে গেছে। সব কিছুতে বিরক্তি বোধ হয়। আগ্রহ নেই, প্রাণ-চাঞ্চল্য নেই। কামনা শরীর মনকে গ্রাস করেছে বিষাক্ত সর্পের কুণ্ডলিতে। মুখ তুলে কারুর সামনে কথা বলিতে দ্বিধা হয়। মনে হয় কাম-কালিমায় যেন সারামুখ মলিন, অপরাধীর ছাপ চোখে অঙ্কিত। দূরে দূরে আড়ালে সরে থাকতে হ'ত। প্রেমের যন্ত্রণা কখনও অত গভীর হয়? দুঃখ—তুচ্ছ উপমা! মনে হয় দারুণ যন্ত্রণা নিয়ে সহস্র মৃত্যু পার হয়ে আসছি, ওঃ!

কিন্তু সে তো পরের কথা। বিংশবর্ষের পরের দিনগুলি কি করে কাটল? ওই সর্ব্বগ্রাসী, দেহকামী প্রেমের পূর্ব্বে ছিল নিশ্চিন্ত কতকগুলি প্রজাপতি দিন। রঙীন পক্ষ তাদের, আরাম ভ্রমণ।

রূপালী ইতিহাস উল্টে ফিরে এল। ঘড়ি অতি দ্রুত চলছে। সময় নেই, অনেক বাকী এখনও।

আই-এ পরীক্ষার পর রূপালী শিলং গেল দীর্ঘদিনের জন্য বেড়াতে। গাড়ীতে সমস্ত রাস্তা ঝড়-বৃষ্টিতে আচ্ছন্ন। ভাল লাগছিল না রূপালীর কলিকাতা ছেড়ে যেতে। ইচ্ছা ছিল হিন্দীগান ভাল করে সে শিখবে। প্রোফেসার চৌধুরীর আকর্ষণ কমে গেলেও তিনি রইলেন কলিকাতায় পড়ে। গাড়ীর চাকার ধ্বনিতে তাই একটা আর্ত্ত বিরহগাথা শোনা যাচ্ছিল। জানালা দিয়ে ঝুঁকে কাল খোয়া-ঢালা লাইনের দ্রুত গতির প্রতি লক্ষ্য রেখে সারা রাস্তা বিমনা ভাবে বসেছিল সে। যাবার ইচ্ছা ছিল না তার শহর ছেড়ে বাইরে। এই ইঁটকাঠের আবেষ্টনের মধ্যে যেন তার কোন পরম সম্পদ লুকান রয়েছে। কোন বন্ধন নেই শহরের সঙ্গে, তবু ছেড়ে যেতে মন ব্যাকুল হচ্ছে।

শিলংএ বাড়ীর পাশে পাঞ্জাবীদের বাড়ী। কর্ত্তা এঞ্জিনীয়ার। বড়ছেলে কলিকাতাতে কাজ করে। মেজ পড়ে এলাহাবাদে। ছুটীতে সকলে বাড়ী আসে! বড় মেয়ে বিবাহিতা। ছোটমেয়ে কলেজে যায়। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল।

লাইলী রূপালীকে অশুদ্ধ ইংরাজিতে এবং শুদ্ধ হিন্দীতে বোঝাল—তোমার নাম রূপালী, আমার নাম লাইলী। আমরা তো সখী।

শিলংএর গোলাপবিছান রাস্তায় দুইজনে সর্ব্বদা বিচরণ করে ফিরতে লাগল। ধীরে ধীরে আবার রূপালীর জগৎ থেকে প্রেম মিলিয়ে গেল। আনন্দমুখর, বন্ধুসমাকীর্ণ প্রবাস! লাইলীর কলেজের সহপাঠিনী ক্যাথ্‌লীন্‌, টেরেসা, শকুন্তলা, শিরীন, চিত্রা, অনেকের সাহচর্য্য লাভ করল রূপালী। পাঞ্জাবী মেয়ে শকুন্তলাকে

দেখিয়ে লাইলী রূপালীকে জানাল যে, তার মেজ ভাইএর সঙ্গে এর বিয়ের কথা চলছে। কয়েকদিনের মধ্যে তার বড় তুই ভাই বিদেশ থেকে ফিরবে। তারা খুব সুন্দর দেখতে। কি রকম সুন্দর সেটা যেন রূপালী নিজে দেখে।

মনে মনে হাসত রূপালী। পুরুষের সৌন্দর্য্য হচ্ছে বাঙলা দেশে—ভাব-বিহ্বল নয়নে আর বুদ্ধিদীপ্ত সুকুমার মুখে। সে মুখের প্রতিটি রেখা হৃদয়ের পরিচয় জানায়। শিক্ষিত, ভদ্র অন্তঃকরণ প্রতিটি ভাববিকাশে ধরা যায়। কোমল অনুভূতি-বিচিত্রিত মুখচ্ছবি যে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলার নিজস্ব দান।

পাঞ্জাবী যুবক হয় দীর্ঘ-সবল, কিন্তু রুক্ষ তার সৌন্দর্য্য, বর্ব্বর তার মুখ। একটা অশিক্ষা, উদ্দাম চরিত্র যেন চোখেমুখে অঙ্কিত। পাঞ্জাবী যুবকের দেহের ওপরে বাঙালী মুখ—সেইত সৌন্দর্য্যের আদর্শ।

শকুন্তলাকে পরিহাস করত রূপালী টেরেসা-দের সহযোগে—জানিস না, চারদিন পরে ওর প্রেমিক আসবে? তাই ওর এত হাসি। জড়িতে তাই বুঝি বেণী বেঁধেছে। সালোয়ারের বাহারই বা কত? আর দেখ ভাই, কানের মুক্তোর ফুল। কি গো শকুন্তলা, এত সজ্জা কিসের?

একটা ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ভেতর থেকে উঠে আসে। প্রকৃতির অনবদ্য শোভা চারদিকে। পথে পথে ফুলের উৎসব। জল-প্রপাতের নুপুরনিক্কণ। মেঘাচ্ছন্ন শিলং-পিকের রহস্যময় ইঙ্গিত। আর দিবাশেষে শীর্ণ চন্দ্র। হাতে কিছু নেই—পড়া-শোনা সাম্প্রতিক ভাবে সমাপ্ত। দিন লঘুগতি অপ্সরার পক্ষে বিচরণশীল। কর্ম্মবিহীন সময়। পঞ্চশর সহসা আক্রমণ করেন। শ্যাম বৃক্ষলতা মনকে কোমল করে তোলে। দেহ জাগ্রত হয়ে

আহার্য্য ভিক্ষা চাই, অণুপরমাণু প্রার্থনা করে অন্য কোন সত্তা। কি যে সে সত্তা করবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারনা থাকে না চোখবাঁধা কলুর বলদের অজ্ঞানতার মধ্যে যৌবন একদিকেই নির্দ্দেশ করে যায়।

পাঞ্জাবী মেয়ে শকুন্তলা, জীবনে সে ইব্‌সেনের নাম শোনে নি, প্রেমকে 'গ্র্যাণ্ড্ প্যাশন' বলে অবিহিত করলে সূর্য্যাপরা আয়ত চোখ মেলে গরুর ভাবে চেয়ে থাকে, তারও আছে প্রণয়ী! সে কি সুখী! রূপালীর নেই কেউ এখানে—এখানে এই রূপরসের লীলাক্ষেত্রে, যেখানে মানুষ শুধু আসবে প্রেম করতে। মনে ক্ষীণ আশা আসত—লাইলীর দুই ভাই আসবে শীঘ্র। হাতের কাছে তাদের পাওয়া যাবে। কিছু না পাওয়ার চেয়ে যা পাওয়া যায় তাই ভাল। অবশ্য একটি পূর্ব্বেই হস্তান্তরিত।

সূক্ষ্ম ঈর্য্যার ভাবটি মুহূর্ত্তে দমন করে হাস্যালাপে রূপালী যোগদান করত। কিন্তু, নিছক নারীসাহচর্য্য আর ভাল লাগে না। শিশুকালে, জীবনে পুরুষ আসবার আগের কালে যা ঘটেছিল, তার পুনরুক্তি হয়নি। সন্থনা, মণিকা, মাধুরী, চম্পা—রূপালীর প্রেম-জীবনে আর তারা ফিরে আসেনি। মেয়েদের সঙ্গে যথেষ্ট মেলামেশা সে করেছিল। কখনও অন্যপক্ষে মানসিক চাঞ্চল্য দেখা গেছে। নিঃসঙ্গ কোন নারীহৃদয় তার জন্য ব্যাকুল হয়েছে—কারণ তার ছিল 'animal magnetism' অদম্য আকর্ষণী, নির্ব্বিচারে কাছে যে আসছে তাকে সে আকর্ষণ করে যাবে। এই তার ধর্ম্ম। স্বল্পভাষী কিন্তু চঞ্চল মেয়েটির স্থির চুম্বক শক্তিকে অতিক্রম করে চলে যাবার সাধ্য নিকটবর্ত্তী কোন প্রাণীরই ছিল না। কত বান্ধবীর চোখের তারায় বাসনা দেখেছে রূপালী, কত বয়োজ্যেষ্ঠার স্নেহে অস্বাভাবিক প্রবৃত্তির

বিকাশ! কত পার্শ্ববর্ত্তিনীর মুখে সহসা কামনার বিদ্যুৎচমক তার নিশ্চিন্ত চিত্তকে সচকিত করে গেছে। সমস্ত বুঝত সে, কিন্তু সাবধানে দূরে সরে যেত। নারী কখনও তার হৃদয়ে প্রীতি ও সহানুভূতি ভিন্ন প্রেম জাগায়নি। মানুষের রচিত ক্ষুদ্র সমাজবন্ধন সে স্বীকার করত না, কিন্তু প্রকৃতিকে অতিক্রম সে করেনি কখনও। ধর্ম্মকে সে মানত, আর ভালবেসে যেত নির্ব্বিকার, নিগু'ণ ঈশ্বরকে! ঈশ্বরের বিপক্ষে কখনও সে যেতে পারেনি। যেতে চায়ওনি।

ঊর্দ্ধশ্বাসে লাইলী ছুটে আসল—রূপালী ভাই, চল দাদারা এসেছে। মাকে বলে এস ওইখানেই চা খাবে আজ বিকালে।

বাংলার বাহিরে আলাপ অতি প্রগাঢ় হয়, সে আলাপে সঙ্কোচ বা দূরত্ব থাকে না। পাঞ্জাবী মেথাপরিবারে বিদেশ-প্রত্যাগত ছেলেদের দেখতে বাঙালী-প্রতিবেশী রূপালী অনায়াসে ছুটে উপস্থিত হ'ল।

আমি শিলং যাইনি। চোখের ওপর কিছুই দেখিনি। রূপালী আমাকে সব বলেছিল। তীর্থযাত্রীর প্রথায় প্রত্যহ সে দিনপঞ্জী লিখে যেত কলিকাতা ফিরে আমাদের দেখাবে বলে। তখন বাহ্যতঃ বড় ছেলেমানুষ ছিল সে। না, আগাগোড়া ছেলেমানুষ ছিল রূপালী। মন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মন বেড়ে উঠেছে। সাংসারিক জ্ঞান হয়নি। একটা কথা চুপি চুপি বলে দেই পুরুষদের এখানে। চরিত্রহীন নারীর মুখেচোখে কালিমার ছাপ পড়ে বটে, কিন্তু প্রেমিক-নারীর মুখ থাকে কোমল, সরস। ছেলেমানুষের মুখ আর যুবতীর দেহ। মন তার সতত লীলাউচ্ছল, অনুভূতি তৃপ্ত। বুভুক্ষু যৌবন তাকে দিশাহারা করেনি। সে মুখ দেখে অনেকে ভুলে যায়, ভাবে

নিষ্পাপ শিশু। পপিয়ার মুখ ছবিতে দেখেছ, নীরো-বিজয়িনীর? সারা ব্রার্ন্‌হার্টের চোখ দেখেছ, সহস্র-উপভোগ্যার?

—সেই সংক্ষিপ্ত, অসমাপ্ত ডাইরির পাতাগুলো আর রূপালীর মুখের কাহিনী অবলম্বন করে যে আখ্যায়িকা গড়ে তুলেছিলাম, তার সবটা আজ রূপালীর মনে নেই। শিলং তার মনে আছে, চিরদিন থাকবে। কিন্তু সে অবাঞ্ছিত স্মৃতির অংশবিশেষ মনে রাখেনি।

মেয়েদের মনই এই। যেটুকু ভাল লাগে না সেটুকু অবাধে তারা ভুলে যায়। মনে রাখার কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। তাই অনেকে ভুল ক'রে নারীকে একমুখী বলে। তারাও বহুমুখী, তাই অত আড়ম্বরের সঙ্গে মনুর অনুশাসনের প্রয়োজন হ'য়েছিল। চঞ্চলা নারীকে স্বাধীনতা দিতে, বিশ্বাস করতে আদিমানব নিষেধ ক'রে গিয়াছেন। মেয়েরা একমুখী নয়, তারা আত্ম-প্রতারক শিল্পী। তবে সাধারণ পুরুষের সঙ্গে সাধারণ মেয়ের প্রভেদ, পুরুষ একসঙ্গে একাধিকাকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু নারীর প্রেম একের পর একে।

রূপালীর ডাইরি—(শিলংএ)

'১৫ই মে—সকালে বৃষ্টির জন্য বাহির হইতে পারি নাই। বৈকালে আমি, লাইলী ওঙ্কারনাথ আর শকুন্তলা লিডন্‌ ও বিশপ্‌-ফলস্‌ দেখিতে গেলাম। বহু পথ চলিতে চলিতে অবশেষে বিডন্‌-ফল্‌সের ক্ষীণধারা দেখিলাম। উপরে পাওয়ার হাউস্‌—জলস্রোত ছোট শিলার মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গিয়াছে! মধ্যে মধ্যে বড় পাথর। লাইলী একটু হইলে জলে পড়িয়া যাইত। উপরে চড়াই-সদৃশ্য পথ বাহিয়া, শর্টকার্ট রাস্তা ধরিয়া আমরা চলিলাম। একপাশে ঝরণা, অন্য পাশে কানাল, মধ্যে

সরু প্রাচীরের ন্যায় দুই হাত বাঁধান পথ। আমরা বিডনের উৎপত্তি স্থান দেখিতে গেলাম। কি সুন্দর দৃশ্য! উচ্চ হইতে বারি-রাশি হুঙ্কার শব্দে নীচে গভীর খাদে পড়িতেছে। সে স্থান হইতে জল আবার একটি ঝরণার আকারে নীচে নামিয়া বিশপের ধারার সহিত মিশিয়াছে। বিডন পূর্ব্বে প্রকাণ্ড ছিল। এখন নানাদিক হইতে ধারা লইয়া স্থানীয় লোকেরা জলকে ক্ষীণ করিয়াছে। অসম্ভব সরু রাস্তা ধরিয়া আমরা ফিরিতে লাগিলাম। এক দিকে বহু নিম্নে ঝরণার জল আসিয়া পড়িতেছে, অন্য দিকে স্রোতোময় কানাল, যে কোন দিকে চাইলেই ভয় হয়। লাইলী, শকুন্তলা এই দেশের লোক। তাহারা অনায়াসে আগে চলিয়া গেল। বাধ্য হইয়া আমার ওঙ্কারনাথের সাহায্য লইতে হইল। বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা লাগিল।'

টীকা :—ওঙ্কারনাথ—লাইলীর মেজ-ভাই, শকুন্তলার প্রণয়ী। এলাহাবাদে ডাক্তারী পড়ে। বয়স বাইশ, রূপে গ্রীক দেবতা।

তোমার ডাইরিতে সেদিন এর বেশী ছিল না, কিন্তু, আমার জেরার উত্তরে অনেক কিছু স্বীকার তুমি করেছিলে, রূপালী। 'বাধ্য হইয়া?'—আশ্চর্য্য, ওই রাস্তা পার হ'তে সত্যই তুমি পারনি? কলেজে তুমি টেনিস চ্যাম্পিয়ন, পদভ্রমণে তুমি অদ্বিতীয়া। কাঠবেড়ালীর মত বটানিক্যাল গার্ডেনে তোমাকে গাছ বেয়ে উঠতে দেখেছি আমি। খেলা-ধূলায় অনুরাগ ছিল তোমার পরম পাঠস্পৃহা সত্ত্বেও। তাই তোমার দেহ অত গঠনপারিপাট্যে মনোরম ছিল। তুমি রাস্তা পার হওয়ার মিথ্যা ভীতি দেখিয়েছিলে, ভান করেছিলে। তুমি খেলোয়াড় চিরকালের। কৈশোরে লজ্জা খেলায় বাধা দিত, যৌবনে বেপরোয়া হ'তে মাঝে মাঝে। কেন ভান করেছিলে? 'সাহায্য' নেবার উদ্দেশে। সাহায্য? তাকে সাহায্য ব'লে না, ব'লে

আলিঙ্গন। এক হাতে সজোরে জড়িয়ে ধ'রে অন্য হাতে পাণি-গ্রহণ ক'রে সারা পথ চলার নাম সাহায্য ? এত মিথ্যাও লিখতে পার, রূপালী !

১৬ই মে—'সকালে Cronin-এর 'Hatter's Castle' পড়িলাম বসিয়া বসিয়া। ১টা'র সময়ে বাড়ীর সকলে 'বড় বাজার' দেখিতে গেলাম। আজিকার বাজারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বেশীর ভাগ বিক্রয় ক'রে পশারিণীরা। জুতা হইতে আরম্ভ করিয়া শাক-সব্জী সমস্ত আছে। লোকজন অনেক আসিয়াছে। মাছের আমদানীও প্রচুর। আমরা কিছু মাছ কিনিয়া আনিলাম। একজন বালিকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া চা ও মিষ্টি বিস্কিট বিক্রী করিতেছে। দেকানী স্ত্রীলোকেরা বসিয়া বসিয়াই কিনিয়া খাইতেছে। দুই একজন পশারিণীকে দেখিয়াই মনে হয় বার্ণসের লাইনগুলি :—

"To see her is to love her
And love her but for ever.
For nature made her what she is,
And never made another."

এতই সুন্দর মূর্ত্তি তাহাদের।

বিকালে কোথাও যাই নাই। ওঙ্কারনাথ আসিয়াছিলেন।'

১৭ই মে—'সকালে লাইমখারের দিকে গিয়াছিলাম বেড়াইতে। বিকালে ওঙ্কারনাথ আসিয়াছিলেন।'

১৮ই মে—'সকাল ১০-৩০-এর সময়ে আমরা সকলে ও মিষ্টার মেথার পরিবারের সকলে একত্রে ননক্রেম গিয়াছিলাম 'শীমের' বাড়ী খাসিয়াদের জাতীয় নৃত্যোৎসব দেখিতে। পাঁচখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া যাওয়া হইল পরম আনন্দে। মিষ্টার মেথার বড় ছেলে কৃষ্ণনাথ ক্যামেরা লইয়া গিয়াছিলেন।

আমাদের সকলেরই ছবি তোলা হইল। খাসিয়াদের নৃত্য একঘেয়ে, বিশেষ ভাল লাগিল না।

বিকালে বাড়ী ফিরিয়া লাইলীদের বাড়ী গিয়াছিলাম।'

২২শে মে—'অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় কয়েকদিন লিখিতে পারি নাই। মধ্যে একদিন শিলং হইতে চেরাপুঞ্জী পিক্‌নিক্ করিতে গিয়াছিলাম।

আজ সকালে লেকে গিয়াছিলাম, আমি, ওঙ্কারনাথ, কৃষ্ণনাথ, লাইলী ও লাইলীর বাবা। পথে শকুন্তলার সহিত দেখা হইল। সে লাইলীদের বাড়ী যাইতেছিল।

বিকালে কৃষ্ণনাথ আসিয়াছিলেন।'

যথেষ্ট! আর ডাইরির লিপি উদ্ধারের আবশ্যকতা নেই কিছু।

দুই ভাই-এর মধ্যে ওঙ্কারনাথকে ভাল লেগেছিল রূপালীর। রূপ—গ্রীক দেবতা! পাঞ্জাবী পুরুষের অমার্জ্জিত রূপও কমনীয়তায় তার মুখকে আশ্রয় করেছে। ছয়ফুট লম্বা প্রবল বলশালী দেহের উপরে নারীর মত কমনীয়, কিশোর মুখ। স্বপ্নজড়িত আয়ত, অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন; চিবুক সংক্ষিপ্ত, তাই মুখে একটা কোমল মেয়েলী শ্রী। মুখের দিকে তাকালে মনে হয় কিশোর বালক—স্বপ্ন দেখে আর কাব্য রচনা ক'রে দিন যায়। কিন্তু দেহের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যৌবনবাসনায় উদগ্র এর শরীর।

গরুর মত ভাবশূন্য, ঠিক্‌রে-বের-হওয়া চোখ আর বড় ঘোড়ার দাঁতের আকারের দন্তশ্রেণী যে শকুন্তলার, সেই এর প্রিয়া? মোচড়ান দড়ির মত শরীর, লাবণ্যের লেখা নেই। কঠিন পুরুষ ভাব, যেন একটি ক্লীব, তা যতই কেন কানে ঝুম্‌কো দোলাক আর জড়িজড়ান জর্জ্জেট পড়ুক।

লালিত্যহীনা, শিক্ষাবিহীনা মেয়েটির এত সৌভাগ্য!

ছেলেবেলা থেকে উভয় পরিবারে বিয়ে ঠিক ক'রে রেখেছে। তাই! কখনও ওঙ্কারনাথ শকুন্তলাকে ভালবাসতে পারে না!

প্রবল সহনুভূতিতে রূপালীর হৃদয় তরল হ'য়ে গেল। সুন্দর চমৎকার ছেলেটিকে সকলে মন্ত্রণা করে পঙ্কস্রোতে নিমজ্জিত করেছে! বড়ভাইয়ের কিছু ঠিক হ'বার আগেই এর বিয়ে ঠিক করে রেখেছে।

নিশ্চেষ্ট মন, অলস দিনযাত্রা। হঠাৎ এক ক্রূর প্রবৃত্তি দেখা দিল—দেখি না, শকুন্তলাকে এ সত্যই ভালবাসে নাকি, আমার মত মেয়েকেই বা এর ভাল লাগে কি না। ক্ষতি কি, আমি তো চলে যাব শিলং ছেড়ে, শকুন্তলার ভাবী স্বামী তারই থাকবে। আমি তো কিছুই চাচ্ছি না। ভালবাসাও চাই না। শুধু চাই মোহের রংএর চোখে প্রলেপ জড়াতে, যা'তে প্রবাস কেটে যাবে মাধুর্য্য-উত্তেজনায়। নিজের অস্বস্তিকর বিবেককে সেইদিন রূপালী এই বলে ভুলিয়েছিল।

কেউ বুঝতে পারেনি। সে ইচ্ছা না করলে, যারা তাকে বিশেষভাবে চেনে বা লক্ষ্য করে, তারা ভিন্ন কেউ তার মনের ভাব বুঝতে পারত না। অনেক ক্ষেত্রে তার লক্ষ্যস্থল নিজে পর্য্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে চিন্তা করত। চিত্তদৌর্ব্বল্য বশ করে বাহিরের সুদূর ভঙ্গি রূপালীর সম্পূর্ণ আয়ত্তে ছিল।

ওঙ্কারনাথ ধরা দিল সাগ্রহে। ইংরাজি ভাষায় উভয়ে আলাপ করত নানা বিষয়ে, কিন্তু চোখে চোখে অন্য কথা হ'ত শরীরের ইঙ্গিত অন্য ইচ্ছা প্রকাশ করত। অন্য জাতি, অন্যের সম্পত্তি! সমস্ত নিষেধবাণী আরও আকর্ষণ বাড়িয়েছিল।

"—the fruit Of that forbidden tree"—চরম সত্যবাণী পিউরিট্যানিক কবি বলে গেছেন, যদিও তিনি প্রাচীন ছিলেন।

পাঞ্জাবী জাতি, ইংরাজি ভাবে মানুষ। কত অজুহাতে স্পর্শ করবার সুযোগ হ'ত! বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্নজাতি পুরুষের অহেতুক বাসনাময় স্পর্শে সূর্য্যদেবের হাতের স্বর্ণবীণার মত দেহ বেজে উঠত রূপালীর। সে সুর ওঙ্কারনাথকে স্পর্শ করত, মুগ্ধ যুবক ভুলে যেত দেশ, ধর্ম্ম, জাতির পার্থক্য। ভুলে যেত তার বিবাহ স্থির, তার স্বদেশিনী প্রিয়া পাশেই বিদ্যমানা।

মোহিতের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল, এ দৈহিক আকর্ষণে প্রেম নেই, জানত রূপালী। কিন্তু, সে ক্ষেত্রের মত ঘৃণা হ'ত না তার! রূপের আকর্ষণ অতি প্রবল, কাছে সে টেনে নেয়। বাধা আরও রোমাঞ্চ যোগায়। আর অন্য জাতি—এইটাই যেন একটা আকর্ষণ, একটা গৌরব। সাধারণ নয় এ ভালবাসা, তাই কোথাও এর দীনতা নেই।

হাতের উত্তাপ পুরুষের নির্লজ্জ কামনা প্রকাশ করে, চোখের ভাষা পূজারীর ভক্তি জানায়। এই ওঙ্কারনাথ।

কিন্তু শকুন্তলা বুঝে ফেলল, সে-ও যে ভালবেসেছিল। বুঝে নিল ওঙ্কারনাথের অন্যমনস্কতা, ঔদাস্য। বুঝে নিল রূপালী আর ওঙ্কারনাথের মধ্যে কি আছে। নিরালাতে একদা রূপালী দেখল শকুন্তলা নীল ওড়নায় চোখ মার্জ্জনা করছে।

তাইতো! ভাল করছি না কাজটা। জীবনে প্রথম রূপালীর অন্য নারীর কথা ভাববার প্রয়োজন হ'ল। অসংখ্য প্রেম-উপাখ্যানে একা নায়িকার ভূমিকা করে সে অভ্যস্ত হয়েছে, এখন অন্যের অধিকার অন্যকে ছেড়ে দেওয়া কষ্টসাধ্য হ'ল। আমার এ অন্যায়! রূপালী ভাববার চেষ্টা করল। আমি অ-সাধারণ মেয়ে—জন্ম থেকে শুনে আসছি। এত নীচ আমি হ'ব না। যে আগে পেয়েছে সেই নিক। 'অন্যের দ্রব্য না

বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।' প্রবল আত্মগৌরব সেবারে রূপালীকে রক্ষা করেছিল—আমি অত ছোট হ'ব না।

অন্য কিছুতে মন দিতে হ'বে—অন্য পুরুষে। একজনকে ভুলবার প্রকৃষ্ট উপায় আর একজনকে অবলম্বন করা। হাতের কাছে রয়েছে কৃষ্ণনাথ। ভাল লাগে না তাকে। পাঞ্জাবী পুরুষের বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় তার মধ্যে প্রকাশিত। বিস্তৃত, গাঢ় লাল অধরোষ্ঠ শিথিল ভাবে সংলগ্ন, চোখের চাহনী তীব্র অথচ মদির। কাল চুলের নীচে প্রশস্ত ললাটে দুই একটি রেখা। সারামুখে একটা লুব্ধতার ছাপ। বাহিরের ভদ্রতা ও পালিশ সেটা ঢাকতে পারেনি। কৃষ্ণনাথের চরিত্র সুবিধার নয়, সেটা রূপালী বেশ বুঝেছিল। মাতাপিতা তার ওপরে প্রসন্ন নয়, যদিও কর্ম্মক্ষেত্রে সে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করত। কিছু পানদোষ ছিল তার। রমণীঘটিত ব্যাপারও সে বহু করেছে। একাগ্র দৃষ্টি তার তরুণীমাত্রেরই দেহকে অনুসরণ করে যেত।

শকুন্তলা রূপালীকে সন্দেহ করেছে। শকুন্তলার পাঞ্জাবজাত শোণিত তপ্ত হয়ে উঠেছে। অন্ততঃ তাকে দেখিয়েও কৃষ্ণনাথের সঙ্গে মিশতে হ'বে। শকুন্তলার সন্দেহভঞ্জন হ'বে, অন্যদিকেও মাথা যাবে। ভয় কি? বাবা মা, সকলের মধ্যে কৃষ্ণনাথ কি করতে পারে? আর ক্যাথ্‌লীনের সঙ্গে কৃষ্ণ যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় মত্ত সে কথা সকলেই জানে। ক্যাথ্‌লীন ফিরিঙ্গি, পরিজন তার মীরাটে। মাসী মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠ দান করেন, তাঁর তত্ত্বাবধানে এখানে ছাত্রীবাসে থেকে ক্যাথ্‌লীন আই-এ পড়ে কলেজে। ক্যাথ্‌লীনও এখানের স্থায়ী বাসিন্দা নয়, কৃষ্ণও চলে যাবে কর্ম্মস্থলে। তাই এ প্রেম লঘু খেলা ভিন্ন কিছু নয়, এতে হস্তক্ষেপ চলতে পারে। রূপালী ভেবেছিল

এদের প্রণয় তারই মত একান্ত মানসিক বিলাস মাত্র, আর কিছু নয়। পরে সে ভুল ভেঙ্গেছিল তার।

কৃষ্ণের সঙ্গে গল্প করতে লাগল রূপালী শকুন্তলাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। একসঙ্গে বেড়াতে বের হ'ত, বাড়ীতে ডাকত তাকে প্রায়শঃ বাঙালী খাবার খাওয়াতে! শকুন্তলাকে দেখিয়ে কৃষ্ণের প্রতি মনোযোগ প্রকাশ করত রূপালী। কিন্তু আর একজনও যে সঙ্গে সঙ্গে দেখে যেত। সে ওঙ্কারনাথ।

ক্রমে কৃষ্ণকে কিছু ভাল লাগল রূপালীর। যে ওঙ্কারনাথ তাকে ব্যাকুল করেছিল, কৃষ্ণ তারই সহোদর। একই শোণিত। রক্তের আহ্বান এক। "Jo's place can only be filled by Jo's sister". আল্‌কাট্‌ বলেছিলেন কথাটা।

কৃষ্ণের লাগল নেশা। এ নেশা তো তার পেশা বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙালী তরুণীর ওপর অন্য জাতির ঝোঁক আছে। বাঙালিনীরা যে তুলনায় দুষ্প্রাপ্য। ক্যাথ্‌লীনকে ফুল পাঠান সে প্রায় বন্ধ করল, টেরেসার বাড়ীতেও তার যাতায়াত কমে এল। সুন্দরী শিরীন কটাক্ষাঘাতে তাকে চঞ্চল করতে পারল না। এরা তো সবাই হাতে থাকবে, প্রবাসিনী শুধু চলে যাবে।

কৃষ্ণ চাইত অনেক বেশী, সে চাওয়ার মাত্রা বুঝবার ক্ষমতা তখনও রূপালীর হয়নি। সহস্র নারীর কাছে সে যা পেয়েছে—এর কাছেও সে তাই চায়। এ মেয়ের মন তারের যন্ত্রের ন্যায়, সমস্ত সুর এতে সর্ব্বদা বাজে না, সে ধারণা তার এল না। আজকে রূপালী স্পষ্ট বুঝছে কৃষ্ণের কথা। পাঞ্জাবী বাঙালী নয়, শরীর-সর্ব্বস্ব প্রেম তাদের। ওঙ্কারনাথও ওই একই বস্তু চাইত জ্যেষ্ঠের মত। কিন্তু সে ছিল কুমার, তাই মনের প্রবৃত্তিকে রাশ বেঁধে রাখবার ক্ষমতা সে হারায়নি।

কৃষ্ণের ওপরে ছিল কৌতূহল তোমার, আজকের রূপালী, স্বীকার কর। চল্লিশ তোমার দেহের বয়স, আশী তোমার মনের বয়স। মোহপ্রলেপে সত্যকে ঢাকবার প্রচেষ্টা কর না। কুশ্রীকে সোনার আবরণে মুড়ে দেখার দিন তোমার নেই। স্বীকার কর। যা করেছ তা স্বীকারে লজ্জা কি? করতে দ্বিধা হয়নি?

ওঙ্কারনাথকে তোমার ছাড়তে হ'বে, অথচ আবার শরীর মন জাগ্রত হয়ে উঠেছে। হাতের কাছে তার ভাই। তারই জন্য তার সহোদরকে জোর করে ভালো লাগালে রূপালী। অবশেষে কৌতূহলও প্রবল হ'ল। সহস্র নারীকে নিয়ে খেলা করেছে এ! অধরের দিকে চেয়ে ভাবতে এ কি ভাবে চুম্বন করে? দীর্ঘ বাহু, বিস্তৃত বক্ষের প্রতি চেয়ে যা ভাবতে তুমি রূপালী, আজ তা মনে করে আলোর নীচে মুখ তোমার লাল হয়ে উঠছে। সে ছিল লম্পটের ওপর নারীর চিরাচরিত আকর্ষণ। বিতৃষ্ণা, ঘৃণা তাকে হ্রাস না করে আরও প্রবল করে।

কিন্তু, কি কাণ্ড তুমি করেছিলে? এ কি তোমার একার প্রেম? চারটি পাঁচটি মানুষকে জড়িয়ে খেলা করেছিলে তুমি। ভুলে গিয়েছিলে তারা বিদেশী। গরম তাদের রক্ত। তারা তোমার প্রেম জানে না, বোঝে না। তারা জানে দেহ, তারা জানে হিংসা, ঈর্ষ্যা, পাপের বীভৎসতা। তারা বোঝে রক্তের অবোধ্য ভাষা।

বড় ভাইকে দেখে যেত ওঙ্কারনাথ হিংস্র পশুর দৃষ্টিতে। তোমার বঙ্কিমহাসি লক্ষ্য করে লোভে সে উন্মাদ হ'ত। শকুন্তলার দিকে চেয়ে ক্ষোভ হ'ত তার। শকুন্তলার আবার তার দিকে চেয়ে তোমার ওপরে ঈর্ষ্যা হ'ত, ক্রোধ হ'ত। ক্যাথ্‌লীন দ্বিগুণ উৎসাহে বেশভূশায় মন দিত। কৃষ্ণকে সে

চায়। কৃষ্ণ চাইত তোমাকে সম্পূর্ণভাবে। তুমি চাইতে—কাউকে নয়। তুমি চাইতে খেলা।

কৃষ্ণ সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল রূপালীকে নন্‌ক্রেমে তোলা ছবিগুলো দেখাতে। হঠাৎ আলো নিভে গেল, কঠিন বাহুপাশে রূপালী বন্দী হ'ল। রুক্ষ চিবুক তার গালে লাগছে—চুরোটসুরভিত ভারী নিশ্বাস মুখের ওপরে। আরও কাছে টানছে কৃষ্ণ।

বিস্ময়চমক কাটিয়ে সবেগে রূপালী নিজেকে ছাড়িয়ে নিল—Don't be silly! I don't want nonsense.

বাসনা-জড়িত স্বরে, গলার টাই ঠিক করতে করতে কৃষ্ণ উত্তর দিল—Why not? I love you.

রূপালী তখনও বিচলিত। সর্ব্বদেহ তার কম্পিত হচ্ছে। সে এ চায়নি, সে আশ্চর্য্য হয়েছে। উত্তেজিত স্বরে রূপালী বলল—I hate you.

সেদিন পাঞ্জাব বাংলার কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল রূপালী। তার উচ্ছৃঙ্খল বেশ, এলোমেলো চুল, ঘরের আলো নেভান, কৃষ্ণের সুস্পষ্ট বাসনামত্ত চেহারা—সব কটাক্ষে দেখে নিয়ে যে দৃষ্টিতে ওঙ্কারনাথ রূপালীদের প্রতি চেয়েছিল, আজও তা মনে হয়ে রূপালীর ভয় করে। দেওয়ালে টাঙান বন্দুক—অজ্ঞাতসারে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছিল ওঙ্কারনাথের। সে জাতীয় পুরুষকে নিয়ে খেলা করবার সাহস রূপালীর আর কখনও হয়নি। তারা খেলা বোঝে না। তাদের নিয়ে খেলা তারা সহ্য করতে পারে না।

পরের দিন একা একা বেড়াতে যেয়ে ভাবছিল রূপালী। বিশ্রী আবহাওয়া ঈর্ষ্যার, কামনার। দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। কোথায় গেল প্রেমের মধুর স্বপ্নের দিন? আদিম প্রবৃত্তি গ্রাস

করতে আসে নির্জ্জন প্রকৃতির বক্ষে। অশান্তি, অজানা ভীতি রূপালীকে উত্যক্ত করে তুলল। ওখানে আর যাব না। কেন যে ওরা দু'ভাই ওইরকম করে? অশিক্ষিত বর্ব্বর, কেবল এক চিন্তা। আচ্ছা, কৃষ্ণ কি সত্যই আমাকে ভালবাসে? লোকে নামে যা বলে সে সব কি সত্য? ক্যাথ্‌লীন তো দেখি 'কির্‌ষানা', 'কির্‌ষানা' বলে পাগল। কিন্তু, কি স্পর্দ্ধা! আমার মত না নিয়ে ওইসব করতে চায়! বেশ শিক্ষা হয়েছে ওর! আমি কি ও এবারে বুঝবে।

কিন্তু, ঘৃণা, ক্রোধ ছাপিয়ে কার সকাম স্পর্শস্মৃতি শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়? চেষ্টা করে সে স্মৃতি ভুলতে হ'ল।

অন্যমনস্ক দ্রুততায় রূপালী প্রায় বাড়ীর কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। রাস্তার পাশে ঝাউ এবং ইউক্যালিপ্‌টাস্‌। বন্যলতা জড়িয়ে ঘন ঝোপের সৃষ্টি করেছে।

ঝোপের মধ্যে শাদা-ফুলতোলা গোলাপী জামার একাংশ দেখা যাচ্ছে, আর তার সঙ্গে জড়িত অবস্থায় ছাইরংয়ের পায়জামা। কাকেও বোঝা যাচ্ছে না, নড়ছে তারা। ঘাসের ওপরে নীলকোট খোলা রয়েছে। ওঙ্কারনাথের না? রূপালী অগ্রসর হয়ে বৃক্ষাবরণ সরিয়ে দেখল—ওঙ্কারনাথ আর—শকুন্তলা নয়—ক্যাথ্‌লীন। জীবনে প্রথম ওই দৃশ্য দেখবার ভীতি-উত্তেজনা অতিক্রম করে রূপালীর চিত্তে এল অপরিসীম ঘৃণা। দাদার প্রণয়িনীকে ওইভাবে উপভোগ করছে সে, রূপে যে গ্রীক দেবতা, কোমল মাধুর্য্যে মুখে এখনও যেন কৈশোর বাঁধা রয়েছে! ওঙ্কারনাথ অবশ্য রূপালীকে দেখেছিল, হেসেছিল একটু। দৃষ্টি তার জয়ীর, হাসি তার প্রতিশোধের।

রাত্রে সেদিন ভাল করে ঘুম হ'ল না রূপালীর। ভাল

করে সে দেখেনি, অনুভবে বুঝেছে মাত্র। তারই উত্তেজনা তাকে বিনিদ্র করে তুলল, ভীতি হ'ল, এল ঘৃণা।

এই ওঙ্কারনাথকে সে ভাল ভেবেছিল? এর জন্য সে ব্যাকুল হ'ত! আত্মধিক্কারে অস্থির হয়ে রূপালী ফিরে কলিকাতা যাবার জন্য অনুনয়ন করতে লাগল বাবার কাছে। কাজের ক্ষতি হচ্ছিল, থাকাও হ'ল অনেকদিন। বাবা রাজী হলেন।

ষ্টেসনে শুধু লাইলী, কৃষ্ণনাথ ও চিত্রা এসেছিল।

জীবনে আর সে ঈর্ষ্যা, পাপ, বাসনার পটভূমিতে অভিনয় রূপালীর প্রয়োজন হয়নি। শিলংএর প্রবাস সে ইচ্ছা করেই ভুলেছে। অস্বস্তিকর পরিবেশে প্রেম, যার মধ্যে অত ভীতি, অত বিপদ ছিল, সে প্রেম রূপালীর কাম্য ছিল না। প্রেমকে সে প্রার্থনা করত কবিতার মত, সঙ্গীতের মত সুন্দর রূপে। আদিম মানবমনের কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে সে স্বীকার করেনি। ভালবাসবে, ভালবাসা চলে গেলে নিরাপত্তিতে দূরে সরে যাবে। এই একান্ত সভ্য প্রেমকে রূপালী উচ্চে স্থান দিয়েছে। যারা ভালবাসে উন্মাদের মত, আবার ভালবাসা চলে গেলে ভদ্রলোকের প্রথায় বিদায় না জানিয়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে ভালবাসাকে বেঁধে রাখবার জন্য, সে সব আদি মানবের প্রকাশ রূপালীর প্রেমইতিহাসের মধ্যে মধ্যে হয়েছে। কিন্তু সযত্নে তাদের পরিহার করে গেছে রূপালী। রাতারাতি ডেস্‌ডিমোনার অমরত্ব লাভ করার প্রলোভন তার ছিল না।

শিলংএ জীবনে আর যাওয়া হয়নি। শিলং মনে হ'লেই চোখের সামনে ভেসে আসে অন্ধকার ঘরে কামুকের আলিঙ্গন, দেওয়ালে ঝোলান বন্দুক—ঝোপের তৃণাসনে সৃষ্টির প্রাচীনতম

বিস্ময়। অস্বস্তিকর, শঙ্কাজড়িত সে স্মৃতি। সুকুমার চিত্তের ওপর তিক্ততার ছাপ দিয়েছিল সেদিন। একা একা বসে ভেবেছে সে আর বিস্মিত হয়েছে, হয়েছে অজানা আশঙ্কায় শিহরিত। প্রেম সুন্দর, প্রেম স্বর্গীয়! কিন্তু তার পেছনে আছে—ওই!

কৃষ্ণ তোমাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে ভাল করেনি, রূপালী তুমি শোন। অবশ্য তুমি কখন কোন পুরুষের হাতে যেয়ে পড়নি। স্বাতন্ত্র ছিল তোমার চির-অক্ষুণ্ণ। দৈহিক তৃপ্তির লোভে কোন পুরুষের হাতের ক্রীড়নক আর যে মেয়ে হ'ক, তুমি হওনি। সাম্রাজ্ঞীর ন্যায় হৃদয়ের উপর দণ্ড-পরিচালনা করতে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, কিছুরই অবকাশ ছিল না সে আত্মবিশ্বাসে। তবু কৃষ্ণ শক্তি তোমার ওপর খাটাতে পারত, জান পল্লবিনী লতা? অনেক খেলা করেছ, বহুবার বিপদে পড়েছ। কিন্তু সে বিপদ থেকে প্রত্যেকবার কে তোমাকে উদ্ধার করেছে? সে ত্রাণকর্ত্তা কি তোমার ঈশ্বর, না তোমার অত্যাশ্চর্য্য আধুনিক সত্তা?

বিষ-দাঁত-ভাঙা নাগিনীর ছোবলের মূল্য নেই। তুমি জানতে তোমার অলজ্ঘ্য সতীত্ব তোমার মূল্য পুরুষের কাছে অনেক বাড়িয়েছিল। প্রেমিকা অথচ অসতী নয়—যুগ যুগ ধরে নারী সম্বন্ধে পুরুষের আদর্শ এই! দেহের সতীত্বে তুমি খুব বেশী বিশ্বাস করতে না। কিন্তু সতী থাকাই সুবিধাজনক। অনেক গণ্ডগোলের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। আর, চারিপাশে গণ্ডী টেনে আকর্ষণ শতগুণ করেছিলে তুমি। কিন্তু, নিজেকে কতটা নামাতে হয়েছিল, কত মিথ্যা আচরণ করতে হয়েছিল তোমার, চারিপাশে এই কৌমার্য্য-মোহের পরিমণ্ডল রচনা করে রাখতে? দূর থেকে শীতল পানীয় দেখিয়ে লুব্ধ করেছ অনেককে, কিন্তু পিপাসা-নিবৃত্তি করনি। পিপাসা-নিবৃত্তি

করনি তাতে আমার বলবার কিছু নেই, নিজের মূল্য তোমার নিজের কাছে অত্যন্ত বেশী ছিল, কিন্তু লুব্ধ করেছিলে কেন?

কৃষ্ণ যদি তোমাকে অপমান করে বসত আমি আনন্দিত হতাম। হ্যাঁ, আমি। আমি, তোমার আজন্ম অকপট বান্ধব। তা'হলে ওই গর্ব্ব কোথায় থাকত? যে আত্মপ্রত্যয় তোমার মোহান্ধ পুরুষকে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় বহুবার ফেলেছে, তার অবকাশ থাকত না। হয়তো, ধরা দিতে তুমি। ধরা দিয়ে সুখী হ'তে। বহুর পিছনে প্রধাবিত হ'বার মানসিক বিলাস তোমার থাকত না। সন্ধান আত্মার উন্নতি করে, কিন্তু কখনও কাউকে সুখী করে না। রূপালী, রূপালী! কেন ভগবান তোমাকে প্রেম দিলেন!

কলিকাতা ফিরে রূপালী দেখল—মহাকাণ্ড! কাকা মনস্থ করেছেন শিল্পী হ'বার জন্য। রূপালীর বাবার পরিচিত এক বয়স্ক চিত্রী ভদ্রলোক নীলাঞ্জন কর প্রায় প্রত্যহ আসছেন। আসছেন কবি বিজয় মিত্র। সন্ধ্যায় বাহিরের বসবার ঘরে সভা জমকিয়ে উঠছে। কাকার বেয়ারা চায়ের গরমজলের তাগিদায় ঠাকুরকে ব্যস্ত করে তুলছে।

আচ্ছা লোক জুটিয়েছ সব—রূপালীর মা দেবরকে সস্নেহে অনুযোগ করলেন—নীলাঞ্জনবাবু তো তোমার চেয়ে অতবড় বয়সে। অথচ ওঁর সঙ্গে তোমার যেন মিতালীর ভাব।

আহা বউদি, উনি যে আমার গুরু। ছবি আঁকতে শেখাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে থাকি ভাল করে বিদ্যাটা আয়ত্তে নেবার জন্যে। অতবড় শিল্পী, সারা ভারতবর্ষে নাম, কিন্তু কি অমায়িক, দেখ আলাপ করে একবার।

না ভাই, ওসব সখে আমার দরকার নেই। তোমার উপযুক্ত

ভাইঝি রয়েছে, কলাবিদ্যার নামে পাগল। ওকেই নিও তোমাদের আসরে। হাসিমুখে রূপালীর মা জর্দ্দার কৌটোর রূপার মুখ খুললেন।

সারাদিন রূপালীর মন গুঞ্জরণ করে ফিরতে লাগল। শিল্পী! শিল্পী! শিল্পী নীলাঞ্জন। রংএ যার অমরাবতী ধরা দেয়। সারা ভারতবর্ষ যাঁর যশোমুখর। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হ'বে এ রূপালীর অভাবনীয় সৌভাগ্য! তাদের সাধারণ বাড়ীতে তিনি আসেন! কাকা যাহ'ক একটা কাজ করেছেন।

কবি! কবি বিজয় মিত্র। তিনিও আসেন। বিশেষ লেখা তাঁর পড়ে নি রূপালী, কিন্তু তবুও কবি তো!

এইতো প্রতিভা। এদের জন্যই বুঝি আমি সন্ধান করেছি। এই বোধহয় আমি চাই। যারা সৃষ্টি করে রংএ, ছন্দে; তারা তো ঈশ্বরের সমকক্ষ সৃজন-লীলায়। তারা ধরণী ত্যাগ করে ঊর্দ্ধে ওঠে মুক্তপক্ষ, লঘু বিহঙ্গমের গতিতে।

কাকা ডাকলেন সন্ধ্যাকালে, রুলি, বাইরে ওঁরা সব এসে গেছেন, তুমি এস। শোন, তোমার কবিতার খাতাটাও এন!

ঘরে ঘষা-কাঁচের মধ্য দিয়ে আলো জ্বলছে। মধ্যের আরাম-কেদারায় শিল্পী নীলাঞ্জনবাবু সমাসীন। হাতে তাঁর বর্ম্মা চুরোট, দৃষ্টি উদাস। পাশে সিংহাসন-আকারের সরু, লম্বা আসনে বসে আছেন কবি বিজয় মিত্র।

উন্মীলিত পুষ্পের হৃদয় রূপালীর দল সঙ্কুচিত করে ফেলল কবি ও শিল্পীর দর্শনে। মনের মধ্যে তার যে শিল্পী, কবি মানুষ অঙ্কিত ছিল কল্পনার রংয়ে, যাদের সঙ্গে আড়ম্বর করে প্রেমে পড়বার জন্য কাল মরোক্কোর, সোনার জলে নাম-লেখা খাতা হাতে সে পারসীক গালিচাতে টীয়াপাখীর কণ্ঠদলন করে

দাঁড়িয়েছে, তাদের পার্থক্য এই মানুষগুলির থেকে অনেক বেশী। হায় স্বপ্নমুগ্ধা তরুণী!

নীলাঞ্জনবাবু বয়স পঞ্চাশ বছর হবে। স্থূল খর্ব্বাকৃতি। ঘনকৃষ্ণবর্ণ, মাথার পশ্চাতে টাক। পানের রসে স্থূল অধরোষ্ঠ প্রলেপাচ্ছন্ন। হাতের সরু আঙ্গুলগুলি আর বিশাল গভীরদৃষ্টি-সম্পন্ন নেত্রদ্বয় ভিন্ন কোথাও রঙের রাজার পরিচয় প্রকট নেই। বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তি, দেখলে সম্ভ্রম আসে—এই পর্য্যন্ত।

বিজয় মিত্র তিরিশের কিছু উর্দ্ধে। শীর্ণ, দীর্ঘাকৃতি। একটা বিবর্ণ শুভ্র বর্ণ। গালভাঙা, স্বাস্থ্যহীন, নিষ্প্রভ মূর্ত্তি। কেবল সকল সৌন্দর্য্য বাসা নিয়েছে তাঁর অধর এবং ওষ্ঠে। পদ্মরাগের মত বঙ্কিম ওষ্ঠ, মনসিজের সেই সাংঘাতিক ধনুর ন্যায়, অধর স্ফুরিত, প্রসন্ন। প্রকৃত কবির প্রকাশ শুধু অধরোষ্ঠের সঙ্গমস্থলে লেখা আছে, আর কোথাও চিহ্ন নেই।

নিরাশ রূপালী উপলব্ধি করল 'কাব্য দেখে যেমন ভাব, কবি তেমন নয়।'

কাকা আদেশ করলেন—তোমার দুই একটা লেখা শুনিয়ে দাও, রুলি। দেখুন তো নীলাঞ্জনবাবু, লেখা-টেখা ওর হ'বে কি না। বিজয় তুমি তো ভাই কবি, তুমি ভাল করেই বুঝবে।

সে সভায় আমার ডাক পড়েনি, কারণ আমি শিল্পী বা কবি নই, সমালোচক হ'বার স্পর্দ্ধাও আমার ছিল না। তবু পাশের ঘর থেকে আমিও রূপালীর কবিতা শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম।

রূপালী পড়ে গিয়েছিল :—

এতদিন ভুল করে কত ভালবাসিলাম,
তাসের প্রাসাদ বন্ধু, অভ্রছোঁয়া গড়ে ;

মিথ্যার বালুর ভিত্তি কতক্ষণ থাকে ?
তাই আজ সে প্রাসাদ মাটীতে লুটায়।
এতদিন দেখে দেখে, এত ঠেকে শিখে,
আবার করেছি ভুল নির্ব্বোধের মত।
সুখ সে আমার নয়—প্রেম শুধু ছায়া,
প্রেতের মায়ার মত আভাসে মিলায়।
শাদা চোখ, হে ঈশ্বর, দাও মোরে দাও আজ,
কবিতা ফিরায়ে নাও,—কর জড়স্তূপ,
কর মোরে সাংসারিক তুচ্ছ, গ্রাম্য মেয়ে,
যারা থাকে সুখে শুধু হাঁড়িবেড়ি নিয়ে।
ভাল যারা বাসে নাই উন্মাদ আবেগে,
ভাল যারা বাসে নাই আমার মতন,
চাহে নাই কোনদিন রোমান্স,
চেয়েছিল গৃহকোণ—সুখী তাই তারা।

স্বরচিত আরও দুইচারিটি কবিতা রূপালী পড়েছিল, কিন্তু আমার শ্রবণমন সমাচ্ছন্ন করে ছিল এইটি। রূপালী শিলং থেকে ফিরে তখন বি-এ পড়ে। জীবনে প্রথম নিজের সঠিক চিত্র রূপালী অঙ্কিত করতে পেরেছিল। মোহ ছিল না সে কাব্যে। প্রথম সে বুঝতে পেরেছিল সে অন্য মেয়েদের পর্য্যায়ে পড়ে না। নিরুপায় সমর্পণে সে নিজের স্বাতন্ত্র্য মেনে নিয়েছিল। অন্য মেয়ের সঙ্গে নিজের তুলনামূলক সমালোচনা যে কতদূর ভুল তাও সে বুঝতে শিখেছিল। তবে, ঠিকপথে চলেনি কেন ? বোঝা আর করা কি এক ? স্বভাবকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না।

রূপালীর কবিতা শুনে নীলাঞ্জনবাবু নড়ে-চড়ে বসলেন সোজা

হয়ে হাতের চুরোট ছাইদানে ফেলে দিয়ে। রাত্রির মত ঘনক'ল চোখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে চোখে চিরতরুণ বাস করছে, দেহ যদিও স্থবির। হাতের অঙ্গুলি তুলি ধরবার ভঙ্গী গ্রহণ করল। বিদ্যুতচমকের মত মস্তিষ্কের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত দিয়ে বয়ে গেল সুস্পষ্ট একটি চিত্রের রূপ—রং পর্য্যন্ত দীপ্ত হয়ে উঠল চোখের সম্মুখে। লেলিহান স্বর্ণবর্ণের অগ্নি, তার সম্মুখে ঋজুদেহা তন্বী। দূরে হিমাচলের শিখর পার হয়ে প্রভাতের আলো তার কাল চুলের ওপর জ্বলে উঠ্‌ছে। হরিৎ-রক্তিম আর কাকপক্ষ কৃষ্ণ। ম্লান-নীল অঞ্চল স্খলিত গৈরিক মৃত্তিকায়। মৃণালের মত হাত দুইখানি প্রসারিত আহ্বান-ভঙ্গীতে। শুভ্র রাজহংসের পক্ষে মত সে বাহু পক্ষপ্রসারণ করেছে সুনীল আকাশে। কার জন্য তপস্যা করছে সে? না, এ তো তপস্যামগ্না পার্ব্বতী নয়। বিশীর্ণ, ঔদাস্যমলিন এর দেহ নয়। যোগকাঠিন্য এর বুদ্ধি-দীপ্ত, মুখচ্ছবিকে নির্লিপ্ত রুক্ষ করে তোলেনি। তাঁর মানসচিত্রে এই তপস্বিনী বাসনায়, প্রেমে মুখর। উদ্বেল এর যৌবন, সংস্কার পদদলিত। কিন্তু, এরাও তপস্যা করে।

বিজয় ভাবাকুল ভাবে তাকিয়ে রইল রূপালীর হাল্কা নীল রংএর শাড়ী-জড়ান মূর্ত্তির প্রতি। প্রেরণা তার চিত্রকরের মত দর্শনমাত্র আসে না, আসে পরে অনুভূতি-উত্থিত হয়ে। রূপালী তার বহু কবিতার প্রেরণা জুগিয়েছিল পরে। একখানি সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ সে রূপালীর সাহচর্য্যে রচনা করতে পেরেছিল। সেই-টিকেই কাব্য-সমালোচকেরা তার কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকেন।

সম্মুখে উপবিষ্ট উভয় গুণীর ভাববিপর্য্যয়ের প্রতি তখন রূপালীর মন ছিল না। সে উন্মনা চিত্তে ভাবছিল সামান্য কিছুদিন পূর্ব্বের ঘটনা—জলধিকুমার আচার্য্য।

এ কাহিনী রূপালীর ইতিহাসে ক্রমিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। কয়েকদিনের মাত্র ব্যাপার। এ রকম রূপালী-জীবনে অসংখ্য ঘটেছে। তাদের সকলের কথা বলা সম্ভব নয়। অঙ্গুরীয়-মাল্যের প্রথা গ্রহণ করলেও মাত্র করাঙ্গুরীর ভার বহন করা কোন মানবীর ক্ষমতাসাধ্য হ'ত না।

জলধি জমীদারপুত্র, বিদেশ থেকে নামের পিছনে বি-এ শব্দ জুড়ে এসেছে। আদালতে ওকালতিতে নাম লিখিয়ে লাল ভক্সহল্ গাড়ীতে ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। রূপালীর মামার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে তিনি ভগ্নির বাড়ী এনেছিলেন প্রকারান্তরে রূপালীকে দেখাতে। বিয়ে করতে চায় না অবশ্য ভাগ্নী, ভগ্নিপতি ও ভগ্নিও তেমন ব্যাকুল নয়, তবে স্বজাতির এমন সুপাত্র পেলে কি তাঁরা ছেড়ে দেবেন ?

রূপালীর মা জলধির কমনীয় কান্তিতে ভুলে গিয়েছিলেন মেয়ের বিবাহ-বিতৃষ্ণা। অগাধ ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি তার সর্ব্বত্র বিস্তৃত। ভ্রাতাকে কন্যার অগোচরে বলেছিলেন—দেখ বলে, রুলিকে পছন্দ হয় কি না। বিয়ে তো দিতেই হবে মেয়ের। প্রায় একুশ বয়সে হ'ল যে, বাইরে যতই ছেলেমানুষ থাকুক না কেন।

জলধি রূপালীর গান, কবিতা শুনেছিল। তরুণ, শান্ত দৃষ্টি মেলে ভাল করে দেখেছিল। লজ্জায় নিজে রূপালীদের বাড়ী আসতে পারত না মামা ধরে না নিয়ে এলে। তবে আগ্রহ ছিল প্রচুর। রূপালীরও মনে ঘোর লেগে গেল। দশবারোটা বাড়ী কলিকাতায়, পাঁচখানা গাড়ী নানা মডেলের! উপাধি আছে, নাম করলে বংশপরিচয়ে সকলে চেনে। এই তো একটা অসাধারণত্ব! শান্ত, সংযত তরুণ। দেখলে মনেও হয় না রাজার মত এর ঐশ্বর্য্য। এ একা সহস্র প্রজার দণ্ডমুণ্ডের

কর্ত্তা। কিন্তু, যদি জলধি ভাবে রূপালী তার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধা, তাই বাইরে অনাগ্রহ উদাসীন ভাব দেখাত রূপালী। কিন্তু অন্তর তার জলধির পশ্চাতে ঘুরে বেড়াত হাতির পিঠে, বজরার বুকে আর লাল ভক্সহল্ গাড়ীর আসনে।

মামার প্রস্তাবে জলধি জানাল সে-ও-এটা ভেবে দেখে নিজে তার মায়ের কাছে প্রস্তাব করে, কিন্তু কলেজে-পড়া মেয়ে আর বিশোর্দ্ধা বলে একমাত্র পুত্রবধূরূপে মাতা রূপালীকে মনোনয়ন করেন নি। স্বাভাবিক স্থৈর্য্যের সঙ্গে জলধি জানিয়েছিল পাশের গ্রামের জমীদার-কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। সুতরাং বিদায় জলধি।

রূপালী জলধির কথা জানতে পারল বাবার ক্রোধপ্রকাশে। জলধি নাকি তাদের অবমানিত করেছে। বিবাহ রূপালীর কাম্য ছিল না। কিন্তু সে চাইত প্রত্যাখ্যানটা একমাত্র তার দিক থেকেই হবে। আত্মগ্লানিতে মর্ম্মাহত হয়ে রূপালী রতীন্দ্রের কথা ভেবেছিল সেদিন। রতীন্দ্রকে ঘৃণা করার এই ফল সে পাচ্ছে না কি? সে ভেবেছিল জলধির মনে তাকে ঘিরে মোহসৃজন হয়েছে, চোখের তারায় জলধির সে দেখেছে সেই মোহ। মিথ্যা তার সে ধারণা। প্রেম নিয়ে খেলা করে চোখ তার খারাপ হয়ে গেছে। সেদিনের মর্ম্মপীড়ার আজও সাক্ষ্য দেয় ওই কবিতা।

জলধি তোমাকে ভালবেসেছিল রূপালী, আমি পরে জেনেছি। বড় ঘরের ছেলে, শান্ত স্বভাব। গোপন করে সে রেখেছিল প্রেম। তোমার অনাগ্রহের অভিনয়কেই সে সত্য ভেবেছিল, বহু-বল্লভ মনের রূপ তোমার তার চক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছিল। তাই তোমাকে বিবাহ করবার জন্য মায়ের সঙ্গে সে বিবাদ করেনি। নির্ব্বিচারে অশিক্ষিতা, ননীর পুতলী ধনীদুলালীকে

মাল্যদান করে অসুখী জীবন কাটিয়ে চলেছে জলধি। তার মানসপটে, তড়িৎপ্রভা, দেখা না দিলেই পারতে?

যাক, ফিরে আসি কবি ও শিল্পী কথায়।

রূপালীর ডাইরি।

'আমার জীবন স্রোতের মত একটানা, একঘেয়ে বয়ে যাচ্ছে। হয়ত তাতে কোনও চাঞ্চল্য সময় সময় আছে, কিন্তু বৈচিত্র্য নেই। জীবনের কি উদ্দেশ তাও বুঝতে পারছি না। হয়ত আমাদের অন্য কিছু আশা করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু মানুষের মনের ওপর কি হাত আছে? হয়ত আমার জীবনে বৈচিত্র্য আছে, যাকে শিক্ষিত ভাষায় বলা হয় সমাজ, আনন্দ ঃ ইংরাজিতে society, amusement. গাড়ীতে চড়ে গঙ্গার ধারে দুই চক্কর বেড়ানো চিত্রগৃহে যেয়ে বিদেশী নায়কের চন্দ্রাকৃতি মুখাভিব্যক্তি অথবা স্বদেশী অভিনেত্রীর ন্যাকামীপূর্ণ অত্যন্ত অসমাপ্ত কীর্ত্তন। কখনও বা বসবার ঘরে অতিসজ্জিতা ও অতিরঞ্জিতা সুন্দরীদের সঙ্গে পরচর্চ্চা অথবা যথেষ্ট জমকালো বেশে যেয়ে নিমন্ত্রণ খাওয়া! এ সবে যে আমার স্পৃহা নেই বলতে পারি না, কিন্তু আমি চাই না আমার জীবনের পরিসমাপ্তি হ'ক এতে।

কি চাই আমি? কি জানি, নিজে তো বুঝতে পারি না কি চাই। তবে হয়তে যা চাই কখনও তা পাব না। পাব না বলে মনের সঙ্গে প্রতারণা করি, তাকে ভুলিয়ে দেই এ আমার কাম্য নয়। তাই হয়তো জানি না কি চাই।

আমার বাড়ীতে কেউ আমাকে বুঝতে পারে না। কোন সময়ে মনে হয় তারা এক জগতে, আমি অন্য জগতে বাস করছি। আমাদের মধ্যে শূন্যতার বিরাট ব্যবধান।

কি চাই আমি? চাই এমন কেউ, যার সঙ্গে আমার কোন বহির্জগতের সম্বন্ধ থাকবে না, মানসিক মিলন হ'বে। তাকে

আমি আমার প্রেমের ছায়া দিয়েও আবৃত করতে চাই না। আমি একজন সাধারণ মেয়ের চাওয়া চাই না—মন্ত্রের দাবীতে একজন পুরুষকে নিকটে পাওয়া। হায়! তা যদি চাইতাম তাহ'লে এতদিন আমার চাওয়া বহুদিন পূর্ণ হয়ে যেত! নিজের মনের শূন্যতা নিয়ে অহরহ নিজের মনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হ'ত না। আমি চাই চিন্তার সংযোগ, আমি চাই একজন বন্ধু।'

রূপালী পাতা উল্টে গেল। এখানে নীলাঞ্জন ও বিজয়ের উল্লেখ আছে। স্পষ্ট করে কারুর সঙ্গে সম্পর্ক কি তা ব্যাখ্যা করেনি রূপালী কোথাও তার জীবনপঞ্জীতে। কিন্তু, চোখ সেখানে পড়লেই সে বুঝে নিত সমস্ত অতীত ঘটনা। নীলাঞ্জনবাবু কিছুদিন তার হয়েছিলেন। কিন্তু বহুক্ষেত্রে রক্ষক ভক্ষক হয়ে ওঠে।

রূপালী আলোর নীচে ভাবছে।

বন্ধুত্ব, মেয়েপুরুষে? হয়। কিন্তু নিছক নিরামিষ বন্ধুত্ব রাখতে হ'লে প্রয়োজন উভয়পক্ষ অন্যস্থানে আবদ্ধচিত্ত হওয়া, অভাবপক্ষে একপক্ষ। তাহ'লেই অন্যদিকে উচ্ছ্বাসের সুলভ সুযোগ হয় না। তাহ'লেই স্ত্রীপুরুষে নিরামিষ বন্ধুত্ব সম্ভব। দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে সখা বলেছিলেন। দ্রৌপদীর ছিল পঞ্চজন চিত্ত আবদ্ধ রাখার জন্য। আর পুরুষোত্তমের কথা তো বলাই বাহুল্য।

পুরুষ বন্ধুত্ব চায় না, আজকের রূপালী বুঝেছে। বন্ধুত্ব স্থাপনা হয় সমানে সমানে। পুরুষকে বন্ধু ব'লে ডাক, সুখী হ'বে। বন্ধুত্বের গণ্ডী টেনে প্রেমিকের আসনে বসতে দিও না, সে বিদায় নেবে। অবশ্য বিগতযৌবনা নারীর বন্ধু হওয়া পুরুষের সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু, বাইশের রূপালী, কেউ তোমার বন্ধু ছিল না।

দিয়েছি অনেক! মনের সমস্ত সুধা উজাড় করে দিয়ে গেছি। পেয়েছি কি? রূপালী তিক্ত হাসি হাসল। শান্তি পাইনি। আশ্রয় পাইনি কোন প্রেমে, যা নারী চিরদিন খুঁজে বেরিয়েছে। আমাকে কেউ ভালবেসেছিল? কেউ না। মোহ রচনা করেছে তারা আমাকে ঘিরে। দেহ ছিল আমার সুন্দর, যৌবন বন্দী। তাই স্তাবকের অভাব ঘটেনি। পুরুষ! তুমি কি? জান তুমি কি? কোন প্রেমিকা জানে তুমি কি? তুমি প্রকৃতির ক্রীতদাস। তোমাতে ঈঙ্গিত পাঠাচ্ছেন জীবশক্তি, তুমি সেই চুলের দড়ি ধরে থিসীয়ুসের গোলকধাঁধা ভেদের মত লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছ। ছিঃ, একে কি প্রেম-করা বলে? বলে স্বাপদ-বৃত্তি।

কী অসহায় জীব! অনেকদিন পূর্ব্বের এক অনুভূতির কথা মনে হ'ল রূপালীর। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন পড়ত সে। বান্ধবী-দের সঙ্গে সখ করে আধুনিক মঞ্চাভিনয় দেখতে গিয়েছিল। নির্ব্বাপিত-দ্বীপ গৃহে সারি সারি পুরুষ স্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে দেখে যাচ্ছে মঞ্চে নৃত্যচ্ছন্দে একটী নারী। সে নারীর বক্ষ আধ-উন্মুক্ত, কটীবাসের রেখা প্রকাশতায় মুখর। রক্ত অধরে শুভ্র করতল স্পর্শ করে দর্শকদের উদ্দেশে সে চুম্বন নিক্ষেপ করছিল।

রূপালী পাশ্ববর্ত্তিনী বকুল বোসকে বলেছিল—পুরুষদের অবস্থা দেখে আমার দয়া হচ্ছে আজ প্রথম। একেতো নিজেরা যৌবনের তাড়নায় অস্থির, তাতে ওদের খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলবার জন্যে এত আয়োজন চারিপাশে। সকলে যেন ষড়যন্ত্র করেছে পুরুষকে সক্রিয় করে তুলবার চেষ্টায়। রাস্তাঘাটে দেখ, মেয়েদের প্রসাধনদ্রব্য নির্ম্মাণ হচ্ছে, বিক্রী হচ্ছে। তার ওপরে এত আয়োজন! কি করে বেচারীরা সামলাতে পারবে?

বকুল আশ্চর্য্য হয়ে বলেছিল—সামলাবার দরকার কি ?

দরকার মনুষ্যত্বের। ভুলিয়ে কাজ উদ্ধার হচ্ছে ওদের দ্বারা। ইচ্ছা থাক, অনিচ্ছা থাক, ওদের মুক্তি নেই। কী সব বোকার দল। ওরা আবার দেবতার আসনে নিজেদের বসাতে চায়! রূপালী উত্তর দিয়েছিল।

ওরা বোকা। সে কথা ওরা জানে না, আর আশ্চর্য্যের বিষয় খুব কম নারীই জানে। মোহমুক্ত চক্ষে ভেবে দেখল রূপালী। তুমিও কি জানতে তখন? সেই বোকার দলের জন্য সারা-জীবন ব্যাকুল হয়েছিলে। রূপালী হাসল। সে ব্যাকুলতার শান্তি আজ তুমি পাচ্ছ। জীবসৃষ্টিকামনায় তোমার সেই নির্ম্মম দেবতা উর্দ্ধ থেকে এপ্রিলফুল করেছেন তোমাদের। পুরুষ হয়েছে নির্ব্বোধ, নারী হয়েছে অন্ধ। এমন সৃষ্টি থাকার চেয়ে ধ্বংস আসুক না কেন? উড়ে যাক ধ্বংসধূলায় আমার এই জীবন-ইতিহাস, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে চূর্ণ হ'ক আমার অতীত জীবন।

পাশের ঘরে উঠে গেল রূপালী আবার। যত ক্লান্তি, যত বেদনা থাক না কেন, এ তার করতেই হবে। কতদিন এমনি কেটেছে। মনের সঙ্গে শরীরের যোগ না থাকলে শারীরিক সুখ নিছক অবসাদে পর্য্যবসিত হয়ে দাঁড়ায়। তবু এ যে তার অভ্যস্ত কর্ত্তব্য।

কিন্তু আজ এর প্রয়োজন নেই। রূপালী ফিরে এসে জানালার পাশে দাঁড়াল। আজ সুষুপ্তির জয় হয়েছে। আজ মুক্তি, গ্লানিকর বাধ্যতা থেকে আজ মুক্তি। পরিবেশ আজ তাকে বন্ধন দিতে পারে না। উড়ে চল মন সেই সুদূর অতীতের বুকে।

How do you do—শ্বেতাঙ্গ হস্তপ্রসারণ করেছিল। পরক্ষণেই নিজেকে সংশোধন করে অসম্পূর্ণ বাঙালী প্রথায় নমস্কার জানাল।

জুলিয়ান্ হ্যারিস্ আমেরিকান, কিন্তু ভারতবর্ষ ভ্রমণকালীন কিছুদিন শান্তিনিকেতনে থাকার ফলে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তার জ্ঞান সাধারণ বৈদেশিকের অপেক্ষা বেশী। নীলাঞ্জনবাবুর চিত্র-প্রদর্শনীতে তিনি রূপালীর কাকার সঙ্গে দর্শক জুলিয়ান্ হ্যারিসের আলাপ করিয়ে দেন। সেই পরিচয়ের প্রামাণ্য লক্ষিত হচ্ছে আজকের চায়ের আসরে।

পূর্ব্বে অনেক বিদেশীর সঙ্গে কিঞ্চিত মেলামেশা করে থাকলেও নিজের গণ্ডীর মধ্যে এমন একটি আপাদমস্তক শ্বেতাঙ্গকে আয়ত্তে পাওয়া ঘটেনি রূপালীর। কৌতূহল, বিস্ময়, পুলক ইত্যাদির সঙ্গে একটা গৌরব, একটা প্রাধান্যের ভাবও রূপালী-চিত্তে দেখা দিয়েছিল, যা অনেক বাঙালীর শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে এখনও হয়।

ঢাকা বারান্দায় চায়ের টেবিল। খোলা আকাশ দেখা যায়। পাশের বাড়ীর বাগানের একটা নারিকেল বৃক্ষ। সে-ও বেগুনফুলী শাড়ীপরা মেয়েটির মত উৎসুক, অধীর। অনন্ত আকাশে সে-ও হাত বাড়িয়েছে।

উচ্চশিক্ষিত, বড়বংশের আমেরিকান যুবককে স্ফটিকস্বচ্ছ পাত্রে চা এবং রূপার রেকাব-বাটিতে গৃহজাত মিষ্টান্নাদি পরিবেশন করতে বেগুনফুলী শাড়ীপরা মেয়েটির কোনও দ্বিধা বা অপ্রতিভ ভাব আসেনি! সে জানত সমুদ্রপারেই হ'ক আর সমুদ্র-এপারেই হ'ক, নরের কাছে নারীর পরিচয় যে সে নারী তাই মাত্র।

হ্যারিস্ রূপালীর ইংরাজি কথাবার্ত্তার দ্রুত নির্ভুলতা,

সপ্রতিভ উজ্জ্বলতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হ'ল। শ্যাম বাংলার নরম মাটিতে এমন মেয়ে দেখার আশা সে করে নি। দেশবিদেশে বেড়িয়েছে, আমেরিকার সমাজে চূড়ান্ত ক'রে মিশেছে, স্বকীয়তা-সম্পন্না নারী সে দেখেছে কম। বাঙালী মেয়ের লজ্জামলিন ভীরুতার অপবাদ আজ বিদেশীর কাছে খণ্ডিত হ'ল।

হ্যারিস্ সাহিত্যসেবী, রূপালী কিছুদিন হ'ল লিখছিল ইংরাজিতে গল্প, প্রবন্ধ। সাহিত্য ছু'জনকে নিকটে এনে ফেলল।

সহসা কুমার-চিত্তে বুঝি নেশা লাগল। ফাল্গুনের অপরাহ্ণ আবেশে বিহ্বল। আলিসার গায়ে মধুমঞ্জরী দুলে উঠছে যৌবন-জাগান বায়ুহিল্লোলে।

সাগরপারের বেপরোয়া শোণিত! কেবল আবেগ ও উত্তেজনার মধ্যে অবাধ চলা তার ধর্ম্ম। সমাজ শাসন সে মানে না, তার নীতিশাস্ত্র আমাদের চেয়ে পৃথক!

অনুরোধে হ্যারিস্ গান ধরল :—

"I love you,

Yes, I love you!

I love you, my own"—নীল নয়নে তার স্বপ্নছায়া।

আমি হেসেছিলাম। ভারতবর্ষের মদির হাওয়ায়, হে আমেরিকাবাসী, তোমারও ঘোর লাগল বুঝি। একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ রূপালীর দিক থেকে ব'য়ে তোমাকে স্পর্শ ক'রে ভুলিয়ে দিল। ভুলিয়ে দিল কৃষ্ণ ও শুভ্র ত্বকের ব্যবধান, ভুলিয়ে দিল স্বাধীন ও বিজিত জাতির পার্থক্য।

পরের দিন রূপালীকে বলেছিলাম। তাকে আনন্দ দেবার জন্য, তাকে সাবধান করবার জন্য বলেছিলাম। রূপালী, হ্যারিস্ কিন্তু অন্য ভাবে দেখছে তোমাকে।

মানচিত্র খুলে পড়বার টেবিলে রূপালী আমেরিকার অবস্থান লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছিল। সাশ্চর্য্যে মুখ ফিরিয়ে কথা বলল। মুখের আনন্দরশ্মি সে গোপন করতে পারে নি!

সুদূর সাগরপারের স্বাধীন দেশের লোক! তাকে ভালবাসছে! এ ভালবাসার যে কি পরিণতি তা ভাবেনি রূপালী কখনও। বর্ত্তমান-বিলাসীচিত্ত তার অকুণ্ঠপুলকে বর্ত্তমানকে উপভোগ করে যেত। অস্বস্তিকর ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যথা, সে ব্যথা এড়ানর একমাত্র উপায় চিন্তা কিছুমাত্র না করা। সহজ উপায়টাই রূপালী অবলম্বন করেছিল।

রূপালী বলল, তোমার কেবল ওই এক কথা। পৃথিবীশুদ্ধ লোকের তো আর অন্য কাজ নেই, কেবল তারা আমার সঙ্গে প্রেমে পড়বার জন্য উৎসুক হয়ে আছে, না?

আমি বললাম—তা তো আছেই।

রূপালী বলল—কেন, আমার কি আছে? আমি তো সুন্দরী নই।

আমি বললাম—সুন্দরীদের সঙ্গে কি মানুষ প্রেম করে? তাদের বিবাহ করে নিজের অধিকারে আনতে ব্যস্ত হয়। সুন্দর জিনিষ দেখলে কিনতে ইচ্ছা হয় না? এ হচ্ছে পুরুষের কালেক্‌শনের প্রবৃত্তি। খুব নিখুঁত সুন্দরী দেখলে আমার তো সম্ভ্রম হয়, বাসনা জাগে না। মনে হয়, দূর থেকে পূজা করি। একটু খুঁত, একটু সাধারণ চেহারার মেয়েরাই মনে ওসব জাগায়।

রূপালী বলল—তাদের অন্য কিছু আছে।

আমি বললাম—হ্যাঁ। যাকে সাধারণ কথায় আকর্ষণী শক্তি বলে।

রূপালী চিন্তিত ভাবে দরজার পাশে আপাদমস্তক প্রতিচ্ছায়া-

সক্ষম আয়নার সামনে দাঁড়াল। রূপালী তারপর আমার দিকে ফিরে বলল—আমার কি আছে।

আমি বললাম—আমি জানি না। যারা তোমার পেছনে অন্ধের মত ঘুরছে, তারাও জানে না। তবে যা আছে, ছেলেরা তাই চায়।

রূপালী অসহায়ভাবে বলল—আমি নিজেও জানি না।

হ্যারিস্ বাংলা শিখবার অজুহাতে আসতে লাগল ক্রমাগত। বিদেশী, সুতরাং তার বিষয়ে অন্য কিছু কেউ বিশেষ ভেবে দেখেনি। কিন্তু রূপালী বুঝত তার নীল চোখের নীরব ভাষা।

বিদেশী! বিদেশিনীকে হৃদয় বোঝান দুরূহ ছিল তার। কি ক'রে হ্যারিস্ বলবে সে কথা, যা অর্দ্ধোন্মুক্ত-বক্ষা, যৌবন-বিহ্বলা মার্কিন তরুণীকে নাচের আসরে, বনভোজনের আয়োজনে, চায়ের মজলিসে বলা চলে? সে বলার ভাষা স্বদেশী কথা, সে পাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। রহস্যাবৃত, আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ। ঘন অরণ্যে যার হিংস্র সর্প, দুরন্ত ব্যাঘ্র, হিম-মণ্ডিত নিশ্চল গৌরীশঙ্কর যার প্রহরী, যে ভারতে রিরংসামুক্ত বৈরাগ্য রাজাসনের উর্দ্ধে স্থান পেয়েছে, যে ভারতে নারী জ্বলন্ত চিতায় যৌবন বিসর্জ্জন দিতে পেরেছে, সেই ভারতবর্ষের সেই রহস্য-সমাকুল নারীকে বলবার কথা বিদেশী কোথা থেকে জানবে? যে নারীর চোখ কাল, কাল মুক্তার মত দুর্লভ কাল, উজ্জ্বল তাম্রবর্ণে যার আতপ্ত সূর্য্যের মদির রক্তাভাস, অধর যার কিশলয়-মসৃণ, পুরুষ অধর-স্পর্শবিহীন সুকুমার, কাল চুলে যার উষ্ণদেশের উজ্জ্বলতা, তাকে কিছু বলতে দ্বিধা হয়, ভয় হয়। তাই কিছু বলা হয়নি। বিজয়ের কাছে হ্যারিস চলে যাবার কিছুদিন পূর্ব্বে স্বীকার করেছিল, বিজয় আমাদের পরে বলেছিল।

বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ওপর সিগারেটের ডগা আঘাত করতে করতে হ্যারিস্ বলেছিল—ওকে হয়তো আমি সুখী করতে পারতাম। বিজয় উত্তর দিয়েছিল, ও একটু অদ্ভুত ধরণের মেয়ে। ওকে বোঝা তোমার পক্ষে কঠিন হ'ত।

জুলিয়াস হ্যারিস্ হেসেছিল, বিচিত্র হাসি।—আমি জানি ও কি চায়। মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে ভালবাসতে গেলে ও কখনই সুখী হবে না। সব কিছু ভুলে স্থূলভাবে, অন্ধের মত নির্ব্বিচারে ভালবাসাতেই ওর মুক্তি।

ভাবতে চাই না জুলিয়ানের কথা। ভাবতে চাই না! চাই না। রূপালী জানালার কাছ থেকে ফিরে এল। সেদিন অনায়াসে তাকে বিবাহ করতে পারতাম। সুখী হতাম। সমাজ ধর্ম্ম দিয়ে আমার কি প্রয়োজন? আমার ধর্ম্ম আমার নিজেকে সুখী করা। কে আমাকে বাধা দিয়েছিল? হিন্দু মেয়েদের অন্ধ সংস্কার, যা আমাকে শিক্ষাদান করেছিলেন আমার অৰ্দ্ধশিক্ষিতা ভালমানুষ মাতা। মেয়ের সুখ চিরদিন তুচ্ছ ছিল তাঁর চক্ষে, সমস্ত গৌরব ছিল ওই জীর্ণ সমাজের অবিচার-গ্রথিত নিষেধ-বিধি পালনে। কেন আমাকে ও কথা ভাবতেও পাপ হয় শোনান হ'য়েছিল? আমি হিন্দু, আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে পরিচয় ছিল না আমার,—আমার পরিচয় আমার মনের। যে মন বিশ্বের সকলের মনে নির্ব্বিচারে বেড়ে উঠেছে, জীবনসঙ্গী-রূপে তার নির্ব্বাচন করতে হ'বে ওই গণ্ডীর সীমারেখার মধ্যে একটি অযোগ্যকে। এর থেকে নিদারুণ পরিহাস আর আছে কি?

আমাকে সারা জীবন অসুখী হ'বার উপাদান যুগিয়ে আজ তুমি দূরে চলে গেছ। জননীকে রূপালী উদ্দেশ ক'রে বলল। তোমার ধারণা ছিল বুঝি একজনের গলায় গেঁথে দিলেই আমার সুখ হ'বে। তা হ'ত যদি তোমরা আগে আমার ওপর জোর

ক'রে বাল্যবিবাহ দিতে। পঁচিশ বৎসরের পূর্ণবয়স্কা নারীর স্বাধীন মতবাদ গঠনের সুবিধা দিতে না। ওঃ, কেন আমাকে অত স্বাধীনতা দিয়েছিলে, যখন জোর খাটালে আমি সুখী হ'তাম, আমি বেঁচে যেতাম। আর যদি স্বাধীনতা দিলে তবে কেন সম্পূর্ণভাবে দিলে না? পঙ্কিল সমাজের চরম বন্ধনে আমাকে বন্দী করে রাখলে কেন? আমাকে! যার মন ছিল বহুবল্লভ, নারীর আত্মভোলা প্রেম পর্য্যন্ত সে মুক্ত মনে বন্ধন পরায়নি।

সমাজকে আমি অস্বীকার করতে বলি না। কিন্তু সমাজের সমস্ত নিয়ম না মেনে একটি নিয়মকে মানবার কি মানে? বিবাহের বয়স পার হ'তে দিলে, অবাধে পুরুষ সাহচর্য্যে বিচরণ করালে, বড় বড় জটিল তথ্য সম্বলিত গ্রন্থাগার চোখের সামনে খুলে ধরলে। তখন সমাজকে তোমরা অস্বীকার করলে। কিন্তু, অবশেষে সেই সমাজের শাসনে আমাকে আদিষ্ট করলে চরম দণ্ডে—বিবাহ করতে হ'বে। এবং হ'বে আমার সমাজের কোনও পুরুষকে।

হায় আধুনিকা! প্রেম তোমাদের নিজের অন্তরের সম্পদ, নিজেদের জন্য। বিবাহ অন্য দশের জন্য।

চার। ঘড়ি জানিয়ে দিল।

Thank you, Love is not my special subject. কে বলেছিল কথাটা? আহা, বড় ভুল হয়ে যায়। কথা স্মরণ থাকে, বক্তার নাম থাকে না। কত মনে রাখা যায়?

বলেছিল জুলিয়ান্। একদিন অপরাহ্নে বেড়াতে এসেছিল রূপালীদের বাড়ী। কথা ঝুঁকে পড়ল ওই দিকে। কেন জানি না, আমাকে দেখলে সমস্ত লোক নিসংশয়ে প্রেমের কথা বলবেই। যেন তেন প্রকারেণ ওই বিষয়টি তোলা চাই।

বলতে পার মেয়েরা যাকে একদিন ভালবাসে পরে তাকে ঘৃণা ক'রে কেন অন্যকে পেয়ে? ছেলেরা কিন্তু সকলকেই সযত্নে রক্ষা ক'রে। আমার জীবনে বহু মেয়ে এসেছে। প্রত্যেকেই কিছু কিছু দিয়েছে। আমি তো তাদের সকলকেই মনে মনে এখনও ভালবাসি।

কথার উত্তর স্বরূপে রূপালী হাসল, একথার আলোচনা সম্যক রূপে সে জুলিয়ানের সঙ্গে করতে চায় না। পাশের ঘরে কাকা, বিজয়। এখনি এ ঘরে তাঁরা এসে যাবেন রূপালী বয়স্কা মহিলার মত অনাত্মীয় পরদেশীর সঙ্গে প্রেমতত্ত্ব আলোচনা ক'রে যাচ্ছে দেখে কাকা কি ভাববেন? কথা এড়িয়ে যাবার জন্য রূপালী উত্তর দিল, কি জানি, আমি বলতে পারব না। তুমি পারবে নিজে। তোমার তো ওসব জানা আছে।

বিদ্রূপ-মিশ্রিত অভিমানের সঙ্গে জুলিয়ান্ উত্তর দিয়েছিল—ধন্যবাদ, প্রেম আমার বিশেষ গবেষণার বস্তু নয়।

শোন জুলিয়ান্, তোমার কথার সেদিন উত্তর দেইনি। হয়তো দিলে এখনকার মত বুঝে দিতে অক্ষম হ'তাম! তুমি ভুল করেছ। মেয়েরা অনেকে ঘৃণা ক'রে না। ব্যক্তি বাদ দিয়ে সমষ্টির বিচার ক'র না। ব্যক্তি সমষ্টির পরিপূরক। আমি ঘৃণা করিনি। সকলকে আমার মনে আছে। মনে আছে অপার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। বেদনা কিছু নেই। প্রেম এসেছে, গেছে। বিদায়ের ব্যথা ছিল না। যা ক্ষণভঙ্গুর সে তো শেষ হবেই। তার জন্য শোচনা কি? একদিন সেই সমস্ত প্রেম আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অপূর্ব্ব হয়েছিল দিবারাত্রি, বিশ্ব রমনীয়। প্রেমিকেরা আর পৃথক নয়, তাদের মনে রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু প্রেমের আছে। তবু যারা সেই দিবসগুলি রচনা করেছিল, তাদের ধন্যবাদ দেই। জুলিয়ান হ্যারিস্, তোমাকেও

ধন্যবাদ। আমার অগণিত প্রেমিক! তোমাদের ধন্যবাদ! কিন্তু প্রেম! তোমাকে অভিসম্পাত।

কত ছবি আজ মনে আসছে। ব্যাকুল হয়ে ওঠে চিত্ত, উন্মাদ হয় স্মরণ। এক এক করে ডাইরির পাতা ধরে মনে করা অসম্ভব। এ কি বাজার হিসাব! খাতা খুলে মিলিয়ে নেব? কোন নিয়ম কোন শাসন মানে না মন। নিজের ইচ্ছামত সে তড়িৎবেগে ছুটে যাচ্ছে—ছুটে যাচ্ছে মত্ততায় সহস্র দিন পার হয়ে।

হিসাব দিয়ে মনের ধারা চলে না। পড়ে থাক খাতা। স্মৃতির পশ্চাৎ যাচ্ছি আমি।

ভাগ্যিস, তোমার চেহারায় দোষ আছে! সমস্ত কিছু আছে তোমার মধ্যে। কোন একজন যুবকের কথায় বক্রবিদ্রূপে আমি বলেছিলাম—নাহ'লে তো সর্ব্বনাশ হ'ত। আপনার আর চাকরি করে খেতে হ'ত না। আমার মুখের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিতেন সময়।

কোনও লজ্জা যেন শেষের দিকে আমার ছিল না। বড় সুদূর হয়ে যাচ্ছিল মন। আর, মাঝে মাঝে যেন ভাল লাগত না। অত পুরুষের মেলা, সকলের একই প্রার্থনা। অরুচি হ'ত। যে খেলা আরম্ভ করেছিলাম শৈশব থেকে, সে খেলা ভাল না লাগলে খেলুড়ীরা শুনবে কেন?

দোলা বোস বলছে কথাগুলো—রূপালী লাহিড়ীর কথা আলাদা ভাই। পথে-ঘাটে ওর ভক্ত গড়াগড়ি যায়।

কোথায় যেন? সবুজ লনের ওপরে বেতের চেয়ার। টেনিস্ র‍্যাকেট্ হাতে বসেছিলাম বিশ্রাম করতে। সামনে বেতের টেবিলে আইস-ক্রীম্-সোডা। ওই সময়ে বাড়ীর কাছে একটা টেনিসক্লাবে ভর্ত্তি হয়েছিলাম।

বাহিরে হেসেছিলাম মৃদু হাস্য। দেখা যাচ্ছিল আমাকে অতি-আধুনিকা, উগ্রপন্থী মেয়ে একটি। সকলে তখন আমাকে তাই ভাবত আর কাছে এসে মিশতে ভয় পেত। তারা জানত না আমার পূর্ব্ব ইতিহাস, প্রথম জীবনের দিনগুলি, যখন বাবা প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হন নি। আমিও চেয়ে থাকতাম বড় গাড়ীতে-চড়া মেয়ের দিকে। মুড়ি চিবোতে চিবোতে আমিও স্বপ্ন দেখতাম টেনিস্ খেলার, মোটর-চালানর। আজ আমি যা, সেই তো ছিল আমার নিজের আদর্শ। সেই সবুজপাড় বসান শাদা শাড়ী আর শাদা জুতো-মোজা!

আমি আজ তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট, চব্বিশের রূপালী! তখন আয়নায় তুমি যা দেখনি, আজ আমি তাই দেখছি। ক্লান্ত।

যেওনা, শোন। নীলাঞ্জনবাবু।

ছিঃ, উনিও ওই। আশা করিনি, ভেবেছিলাম, বিবাহিত, প্রৌঢ়, আমার অকৃত্রিম বন্ধু। সমস্ত কথা বলেছি ওঁকে—মনের সমস্ত কথা। কোন কিছু না জানালে তৃপ্তি হ'ত না, কেউ ওঁর চিত্রের প্রশংসা করলে আমি হ'তাম পুলকিত। কত পরামর্শ দিয়েছেন আমাকে, কত কিছু বুঝিয়েছেন। ভেবেছিলাম সত্যই উনি বন্ধু। ছিঃ, উনিও ওই চান!

রোমের ক্যাপিটল্, জনাকীর্ণ পথ। জুলিয়াস্ সীজার সেনেটে যাচ্ছেন। 'আইডস অফ্ মার্চ্চ!' গণৎকার চীৎকার করে উঠল। সভাসীন সীজার, ব্রুটাস্ নতজানু সিম্বার-ভ্রাতার প্রাণভিক্ষার ছলনায়। কাস্কা সীজারের কণ্ঠে ছুরিকাঘাত করল। অন্যান্য ষড়যন্ত্র-কারীরাও তাই। অবশেষে বন্ধু ব্রুটাস। 'Et tu Brute!' তুমিও!

প্রথম দেখা তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যসভায়। সে ছিল বন্ধু। হ'তে চাইল প্রেমিক। হ'তে পারল না। বিদায় নিল বন্ধুরূপেই। তাই আজও মনে আছে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। সঞ্জীব।

কে যেন ছেলেটি ? চার বছর ভালবেসেছিল নীরবে। দৈহিক শক্তি তার অসামান্য, বড় খেলোয়াড়, মুষ্টিযোদ্ধা সে। বরুণকান্তি। অত বড় শক্তিশালী ব্যক্তি আমার কথায় চলা-ফেরা করত। মজা দেখেছি, গর্ব্ব অনুভব করেছি। কখনও শক্তিপরীক্ষার ছল নিয়ে স্পর্শ করে সুখ পেয়েছি। ভালবাসিনি। ওইমাত্র। তাই সবিনয়ে বিবাহ প্রস্তাব করলে স্পর্দ্ধা দেখে বিরক্ত হয়েছিলাম। আমার জুতোর খরচ যে যোগাতে পারে না, তার আমাকে চাওয়ার সাহস ? তারপর থেকে ঘৃণা করেছি।

একতাড়া চিঠি লিখেছিল মণিময়। কি ন্যাকামীর জয়গান ! ফেলে দিয়েছি। চোখে পড়লেই রাগ হ'ত।

রামপ্রসাদ চতুর্ম্মুখ। মহারাষ্ট্রীয়। এখনও তাকে মনে পড়ে। সুবলদার মুখে বিবাহ প্রস্তাব পাঠিয়েছিল আমারি কাছে। ও জানত আমার বাবা-মায়ের প্রাচীন মতবাদ। প্রথম দর্শনে তার ওপর আকৃষ্ট হয়েছিলাম। জন্মান্তরবাদ না কি ? আর দেখা হয় নি।

ইন্দ্রজিৎ ! অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তার। মর্ম্মর-শুভ্র ললাটের উর্দ্ধে গভীর কাল চুলের কিরীট। আকর্ণ কিন্তু সংকীর্ণ নয়নে শিকারী ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বাসনা-অধীর অধরোষ্ঠ, যখন তখন চুম্বনের রূপ নিচ্ছে। রূপালীর জীবনে প্রথম চুম্বন ! সে-ই করেছিল।

আঃ ! কী অজস্র, অসংখ্য চুম্বন ! কোন উদ্দেশ নেই। বৃষ্টির মত অকাতর দান। প্রতিটি চুম্বন স্বতন্ত্র। অত্যন্ত সংখ্যায় বেশী, মনে রাখা সম্ভব নয় ! নইলে রাখা যেত।

চুপ কর রূপালী, চুপ কর। আমি বলি। সে সব চুম্বনের সাক্ষী আমি। যেখানে-সেখানে। পাগল হয়ে উঠেছিলে তুমি। দৈহিক সম্পর্কশূন্য প্রেমে অভ্যস্ত সহসা বাঁধ ভাঙল। রক্তের স্বাদ পেলে ব্যাঘ্রী প্রবল হয় জান না?

কি সব দেখেছিলাম আমি? একবার ঘৃণা হ'ত, রাগ হ'ত। তোমার মত মেয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য কেন বিসর্জ্জন দিয়ে দেহের সুখ চাইত অন্য দশটা মেয়ের মত?

না! না! আমি দেহের সুখ চাইনি। আমি খুঁজতাম দেহের মধ্য দিয়ে প্রেম, দেহের মধ্য দিয়ে সন্ধান চলত পরম সুখের। পড়েছিলাম লরেন্স এ—

"Close your eyes, my love
Let me make you blind.

*   *   *   *

Is there no hope—
Far from your peering sight."

পড়েছিলাম ডান্ এ :—

"Love's mysteries in souls do grow,
But yet the body is the book".

স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম? না। চুম্বনের বিলম্বিত সময়টা দেখেছিলে, কেউ দেখেনি আমার সম্পূর্ণ সুদৃঢ়তা। সে চুম্বনে কোন অংশ গ্রহণ করতাম না আমি। সে ছিল তার একার চুম্বন। আমার নয়। তাইতো অজস্র চুম্বনে ইন্দ্রজিতের তৃপ্তি আসত না।

চুপ কর রূপালী, চুপ কর। কি সব দেখেছিলাম জান? পর্দ্দাঘেরা বসবার ঘরে কাউচে অতিজড়িত অবস্থায় তোমাদের

শুয়ে থাকতে। তোমাকে আবৃত করেছিল ইন্দ্রজিৎ সমস্ত শরীর দিয়ে। কি করেছিলে সেদিন?

না, না, কিছু করিনি। আমি দেখেছিলাম শুধু ওই রকম আলিঙ্গনে কেমন লাগে। কেন ওর জন্য নারী ব্যাকুল হয়। কুমারী সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দেয়, বিবাহিতা ধর্ম্ম ত্যাগ করে। দৈহিক প্রেম জানতাম না আস্বাদেও। অখণ্ড কৌতূহল ছিল এ মনের। সেই কৌতূহলের তাড়নায় ইন্দ্রজিতের বাহুবন্ধনে অর্দ্ধভাবে ধরা দিয়েছিলাম। কুমারী জীবনে, সাফোর কথায় বলতে পারি, আমিও ছিলাম Eternal Virgin. ইন্দ্রজিৎ আমার কিছুই করতে পারে নি। হয়ত করতে চায়ওনি।

রূপালী, তোমার ভয় হ'ত না? লজ্জা করত না? যদি অন্য কিছু হয়ে যেত, কি করতে?

ভয়? না, ভয় কিসের? আমার সত্তা সে ব্যাকুল আলিঙ্গনের মধ্যে অহর্নিশি জেগে থাকত নিজেকে নিয়ে। দ্রবীভূত আমি হয়ে পড়িনি, যাতে ইন্দ্রজিতের হাতে যে কোন রূপ গ্রহণ করতে পারি। সীতার গণ্ডী এঁকে দিয়েছিলাম চারি পার্শ্বে। সে গণ্ডী অতিক্রম করতে পারত না সে। "Thus far and no further". দেখতাম কতদূর সে এগোচ্ছে, যে কোন মূহূর্ত্তে সমাপ্তির ক্ষমতা আমার ছিল।

আর লজ্জা? লজ্জা কেন? আমি তো কিছুই চাইনি প্রতিদানে তার কাছ থেকে। অন্য অসংখ্য মেয়ের মত তাকে বাঁধতে চাইনি বিবাহ বা প্রেমের বন্ধনে। শুধু মুহূর্ত্তের আনন্দ। সে আনন্দ তো সে-ও পেয়েছে। ঋণী কারুর কাছে কেউ নয়।

কেন অর্দ্ধ-ধরা দিয়েছিলাম সম্পূর্ণভাবে দেইনি? যে মন মুক্ততার জন্য বিখ্যাত ছিল, সহসা এ ঊনবিংশ-শতাব্দীয় মনোভাব কেন সে গ্রহণ করেছিল জানতে চাও ?

অনেক বস্তু আছে সংসারে, যারা অত্যজ্য। ধর্ম্ম তার মধ্যে একটি। আমি জানি আমার ধর্ম্ম ভ্রমত্রুটীপ্রমাদপূর্ণ ; আমি জানি গতিশীল জগতে সে ধর্ম্মের সর্ব্বতো অনুগমন হাস্যকর প্রয়াস মাত্র। কিন্তু সব ধর্ম্মই কি তাই নয় ? জগতে কোথাও আজও সে ধর্ম্ম সৃষ্টি হয়নি, যা মানুষের মনের সমস্ত চাহিদা সম্যকরূপে পরিতৃপ্ত করতে পারে। সুতরাং, আমার ধর্ম্ম ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন দেখিনি !

সমাজ ধর্ম্মের প্রচার কার্য্যের একটি দিক মাত্র।. তবু যখন সমাজে রয়েছি, সমাজের অসংখ্য সুবিধা গ্রহণ করে যাচ্ছি, তখন সামাজিক অনুশাসনে আমার ধর্ম্ম আমার পক্ষে অবর্জ্জনীয়। কৌমার্য্য-রক্ষা সেই কঠোর ধর্ম্মেরই একটি অনুশাসন।

কাপুরুষ ? বল আমাকে। সংস্কার দলিত করবার সাহস আমার নেই ? তথাস্তু। স্বকীয় লোভের জন্য মনোহর কোন অপরাধ করা সাহসের লক্ষণ নয়, সুবিধাবাদীর লক্ষণ। সমাজ-সংস্কারক আজও জন্মগ্রহণ করেনি বিংশ-শতাব্দীর অন্ধ জড়তার বক্ষে।

কিন্তু, তুমি যে সংস্কার-মুক্ত হওনি রূপালী, সে-ও কি সুবিধার জন্য নয় ? যা'তে বিশ্বাস ছিল না, সেটাকে আঁকড়ে ধরে রাখার অর্থ কি ? তুমি নেশাখোর। ভয় ছিল তোমার, একবার দেহের গণ্ডী পার হ'তে আর হয়ত নিজেকে সংবরণ করে নিতে পারবে না। আবার নূতন নেশার দাসত্ব স্বীকার করবে। মানসিক তৃপ্তি নিজেই পাওয়া যায়, শারীরিক তৃপ্তির জন্য প্রয়োজন হয় পুরুষের সহায়তা। তোমার স্বাতন্ত্র্য হয়তো অক্ষুণ্ণ থাকত না। নেশার তাগিদা মেটাতেই হ'ত।

আর, পূর্ব্বেই বলেছি আকর্ষণকে সহস্রগুণ করেছিলে তুমি তোমার তুষার-কঠিন সতীত্বের সীমানা দিয়ে। সমগ্র পুরুষজাতির বিরুদ্ধে এ তোমার ছিল একটি নিষ্ঠুর পরিহাস, রূপালী। তোমাকে দেখে মনে হ'ত সামান্য টোকার আঘাতেই তোমার তাসের প্রাসাদ চূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু, অবশেষে প্রমাণিত হ'ত তোমার প্রাসাদ তাসের নয়—লৌহের। তারপর সেই লৌহপ্রাচীরে কতজন নিরুপায় ক্ষোভে মস্তিষ্ক বিচূর্ণ করেছে সে খবর কি সত্যই তুমি রাখ নি? নিষ্ঠুর! কাউন্ট সাদে কি তোমারও চেয়ে নিষ্ঠুর ছিল?

নীলাঞ্জনবাবুর বিশ্বাসঘাতকতার পরে অনেকে এল, গেল। শিলং পরিত্যাগের পর বহুদিন প্রেম থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল রূপালী। কিন্তু ঘটে ওঠেনি। বাছাই কার্য্যে মনোনিবেশ করেও প্রেমিকের সংখ্যা অনেক রইল। অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য, বিরক্তি দিয়ে বহুকে বিমুখী করল!

আর যেন ভাল লাগে না। চাওয়ার লোক আসে না, অযোগ্যের ভিড়। বাবা-মা প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের বিবাহের জন্য উদাসীন ভাবে কিছু কিছু চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রার্থীর দলের মধ্যে থেকে বাছাই যারা হ'ল ধোপে টিকল না। রূপালীর কাউকে পছন্দ হ'ত না, যদি বা বাবা-মা একটিকে কন্যার উপযুক্ত বলে মনোনয়ন করতেন। বিপদ হ'ল নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে হওয়ায়। সংখ্যা অত্যন্ত কম, তাতে যোগ্যতা আরও কম।

রূপালীর কেন পছন্দ হ'ত না? কারণ সে বিবাহ এড়িয়ে যেতে চাইত। সোজাসুজি বলে নানা বিঘ্ন ঘটেছে, নানা উপদ্রব হয়েছে—মাতার অশ্রু, পিতার ভৎর্সনা। এইভাবে সে এড়িয়ে চলতে প্রয়াস করল। মনোভাব অদ্ভুত। বিবাহ করতে চায় না

বলে পছন্দ হচ্ছে না এবং পছন্দ হচ্ছে না ব'লে বিবাহ করতে চাচ্ছে না—উভয়ই!

আচ্ছা, সেই আই-সি-এস্ ভদ্রলোক? কি মজুমদার নাম না? কেবল বয়স বেশী আর দেখতে বিশ্রী বলে না করা হ'ল। রাজী হ'লাম না কিছুতেই। ভুল করেছি? আজ তা হ'লে এ অবস্থা হ'ত না আমার। সেই আদিত্য? তার সঙ্গে মেলামেশা সম্ভব হ'ল না বলে সেখানেও করিনি। প্রেম করে করে অভ্যাস হয়েছিল খারাপ, প্রেমবিহীন বিবাহ ভাবতেও পারতাম না।

প্রেম কি? বল মোহ। অদ্ভুতমনা তুমি। নেশাখোর মেয়ে, পুরুষকে নাচিয়ে ফিরতে! নানা কথা বলে তাদের রক্তে লাগাতে দোলা, অর্থব্যঞ্জক হাসিতে সপ্তম স্বর্গে তুলে দিতে, কিন্তু মনে মনে হাসতে। সুদূর আকাশ, তোমাকে ধরার সাধ্য ছিল না মাটীর পৃথিবীর। কিন্তু আকাশ, মাটীর মিতালী ভিন্ন দিন তোমার চলত না। পুরুষকে নিয়ে খেলা ছিল তোমার নেশা। কিন্তু নেশারই তুমি বশ্যতা স্বীকার করেছিলে। তাই প্রেমের কাছে অবশেষে হার হ'ল।

কিন্তু আজ এ তারায়—তারায়—কথাবলা রাত্রির আকাশ, এমন ম্লান, মদির জ্যোৎস্না কেবল কি আমার পরাজয়ের কথা ভাববার জন্য? হেরেছি, ক্ষতি কি? প্রেম তো করেছি! কোন প্রেম পায়ে বন্ধন দেয়নি। শতদিকে মন দিতাম ছড়িয়ে, একস্থানে আঘাত পেলেই সান্ত্বনা পেতাম অন্যদিকে।

প্রেম কি? বল মোহ। মোহ! আহা, তা'হলে মোহ কি সুন্দর! হৃদয়ে অন্তর্নিহিত সুখ, তাই জীবনে আনন্দ। কি সুখী ছিলাম। কি মায়া মোহতে?

মনকে বড় বেশী বিশ্লেষণ ক'রে ফেলেছি। মনকে জেরা ক'রে ক'রে প্রেমকে অবশেষে মোহ বলে স্বীকার করেছি। শেষের

দিকে বড় বাড়াবাড়ি করেছিলাম। পৃথিবীতে কত সহস্র পুরুষ আছে, প্রত্যেকের কিছু না কিছু নিজস্ব থাকে। কেউ কবি, কেউ শিল্পী. কেউ রূপবান—একজনের মধ্যে সমস্ত কিছু পাওয়া দুর্লভ। অথচ আমি নিজে ছিলাম সমস্ত কিছুর সংমিশ্রণ। তাই বিভিন্ন দিকে মন চলে যেত। ইন্দ্রজিৎ বলেছিল—You are too brilliant for a single man.

ইন্দ্রজিৎ ধনী পিতার ব্যারিষ্টর্ পুত্র। আলাপ হবার পরে তার রূপ করেছিল আমাকে আকৃষ্ট। অমন মাদকতাময় পৌরুষ, সৌন্দর্য আর দেখিনি, যদিও সুপুরুষ আমার দৃষ্টি এড়াত না।

ওহো! অসীম আবার ফিরে এসেছিল। বিবাহ করে সে সুখী হয়নি, তাই আমার কাছে আশ্রয় খুঁজতে এসেছিল। আমাকে সে অতবড় আঘাত দিয়েছিল, আবার ফিরে আসতে লজ্জা হ'ল না? একদিন বড় ভালবেসেছিলাম, তাই সহানুভূতি হ'ল তার দুঃখের কথা শুনে। সামান্য কয়েকদিনের জন্য ভালও আবার বাসলাম, কিন্তু এবার স্বর্গের দেবতা নয়, ধূলা-কাদার মানুষ। তখন কেউ ছিল না হাতের কাছে। ইন্দ্রজিৎ আসেনি। ভাবতাম বসে বসে অসীমের বলা কথার নিগূঢ় মানে। রাগ হ'ত, কেন সে বিয়ে করে বসেছে, কোনও পথ খোলা রাখেনি। তার স্ত্রীর কথা মনে করে নিজেকে সংবরণ করে নিতে প্রয়াস করতাম চীনের প্রাচীরের অন্তরালে। না, না, না। এ চলবে না। অসীমকে ভালবাসা চলবে না। আমার কি হবে এই নিষেধ-ব্যাহত, লোভনীয় প্রেম নিয়ে? ভাবতাম না ইচ্ছা করে। জানি ভেবে কূল নেই। ইচ্ছা করে ভাবতাম না। যেদিকে স্রোত নিয়ে যাবে যাক। আঃ, নিষেধবাধা থাকলে সে প্রেমের আকর্ষণী শক্তি দ্বিগুণ হয়! কিন্তু, ভুলে থাকবার চেষ্টা করতাম। তোমার ওপরে ভার দিয়েছিলাম ছেড়ে।

শোন তুমি, নির্ম্মম দেবতা! আমাকে কেন তুমি স্বতন্ত্র করে গড়েছিলে? কে তোমাকে বলেছিল? আমি চেয়েছিলাম সুখ, কেন তুমি আমাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিলে? তুমি আমাকে স্বর্গে প্রবেশ-পত্র দেবে না? কি? যদি স্বর্গ বলে কিছু থাকে, সেখানে আমি যাব-ই। আবি সহস্রকে ভালবেসেছি, তবু স্বর্গে যাবার দাবী আমার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবার ক্ষমতা আছে। কারণ তাদের মধ্য দিয়ে আমি যে তোমাকেই ভালবেসেছি। হ্যাঁ, আমি। আমি, যে জীবনে ব্রতউপবাস করেনি, যে কখনও পুষ্প-বিল্বদলে দেবদেবীর পূজার প্রচেষ্টা করেনি, সেই চরম আধুনিকা আমি। আমার মত করে কেউ তোমাকে চায়নি এত তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, যে আকাঙ্ক্ষা কখনও নিবৃত্ত হ'ত না। সে আকাঙ্ক্ষা ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে চলে যেত। সেইখানেই সে তোমাকে প্রার্থনা করেছে। কিন্তু, তুমি তো ধরা দাওনি। কারণ ধরা দেবার ক্ষমতা তোমার নেই। তুমি জড়, মূঢ়, অচেতন শক্তি-স্রোত। তাই ফিরে এসেছি আবার পৃথিবীতে, প্রেমিকের বাহুবন্ধনে, তার অধরের নীরব সোহাগে!

ইন্দ্রজিৎ বলছে গাড়ীবারান্দায় দাঁড়িয়ে—জানি কলকাতার সমাজ! মেয়েরা ছেলে ধরতে পেলে কিছুই চায় না! আমাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে।

রূপালী ব্যথিত হ'ল। আশঙ্কা হ'ল তার যদি ইন্দ্রজিৎ তাকেও ওই ভাবে? ছিঃ! সে বলল—সবাই কি তাই? তোমার এটা জোরের কথা। নিজের দর দিচ্ছ খুব।

অনেক তর্কাতর্কি সেদিন হ'ল। অসীম এসে দাঁড়াল, শাদা লংক্লথের পাঞ্জাবীর ওপরে ভাঁজকরা ছাইরংএর আলোয়ান। বয়সের জন্য বর্ণ ঈষৎ মলিন, শরীর কিঞ্চিৎ স্থূল! এখনও সুপুরুষ বলা চলে। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ! আলিসায় হেলে দাঁড়িয়ে

রয়েছে সৌন্দর্য্যময় গ্রীক্ দেবতা। মর্ম্মরশুভ্র বর্ণে সন্ধ্যার আলো, বাসনাপ্রেমে সর্ব্বদেহ ব্যাকুল। যেন উদ্দীপ্ত অগ্নি; ভস্ম তার কোথাও নেই। এ বাসনা-অনলে আত্মাহুতি দিলেও কোথাও কালি লাগবে না। আর পাশে ভস্মস্তূপ অসীম। যৌবন-অন্তে বিবাহিত ব্যক্তি পূর্ণ-যৌবনা তরুণীর প্রেম লাভ করবার আশা রাখে? সহানুভূতি দূরে যেয়ে ঘৃণার উদ্রেক হ'ল রূপালীর। সাজসজ্জা করে মন ভুলোতে এসেছে আমার? আমার যেন প্রেমিকের অভাব, যাতে ওর মত পুরণো মাল নাড়াচাড়া করতে হ'বে। আমার মত মেয়েকে ওর আশা ও আকর্ষণ করবে। কি পাপিষ্ঠ! আমাকে ও ভোলাতে চায়? কিসের জন্য? ও-ত বিবাহিত। একটি অল্পবয়স্কা মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে চায়। কি ভয়ানক এইসব বিবাহিতেরা। কোনও আশা নেই কি না রোমান্সের, তাই এরা বেপরোয়া। নিজে বিবাহ করেছে! বর্ম্মচর্ম্মের জোগাড় হয়েছে, এখন স্ত্রীকে হেরেমে বন্দী করে পরস্ত্রীর সাহচর্য্য প্রার্থনা করছে। স্ত্রীর কথাও কি মনে হয় না। আগাগোড়া সে ভদ্রমহিলার সঙ্গে নিছক প্রেমাভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে। অতি ভয়ানক এইসব বিবাহিত ব্যক্তি। কুমারদের চেয়ে অনেক ভীতিপ্রদ। তারা তো নিজে বিবাহ করবার ইচ্ছা রাখে। না হ'লেও বাধ্য হয়ে করতে হ'বে বলে সংযত থাকে। আর নারীমনের অলিগলির খবর পত্নীর কাছ থেকে জেনে নিয়ে তারই হতভাগ্য রচনা করতে ব্যস্ত হয় না। তথাকথিত বিবাহিতদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকা সমীচীন।

ইন্দ্রজিৎ বিদায় নিয়ে গেল, ফির্পোতে তার ডিনারপার্টি আছে। সন্ধ্যা ছয়টা। অগ্নি বিদায় নিল। ভস্মস্তূপ কিন্তু অচল রইল। বহুদিন পরে সে রূপালীকে একা পেয়েছে। রাস্তা দিয়ে প্যারাম্বুলেটর্ করে হ্যাড়া-হ্যাড়া খোকাখুকুদের আয়া

ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। রূপালী ঝুঁকে তাদের দিকে চেয়ে রইল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। অসীম বক্রহাস্যের সঙ্গে পরিহাসের চেষ্টা করল—তোমার এমনি একটি দরকার।

কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলত। রূপালী উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। সমস্ত ঘৃণা, সমস্ত ক্রোধ গলার স্বরে ঢেলে দিয়ে বলল—সকলকেই নিজের মত লম্পট ভাববেন না।

মিনিট পনের পরে বসবার ঘর থেকে মায়ের কাছে বিদায় নিল রূপালী। চিত্রগৃহে যাচ্ছে সে মামা অমরেশের সঙ্গে। কোণের সেটীতে অসীমের দিকে সে ফিরেও চাইল না। তার কারণ ক্রোধ নয়, ওধারে যে অসীম বসেছিল তা সে একেবারে ভুলে গিয়েছিল।

যতক্ষণ ঘৃণা ছিল, ততক্ষণও আশা ছিল। যখন বিস্মরণ এল তখনই অবসান। তাহ'লে জুলিয়ান্ কি ঠিক কথা বলেনি—মেয়েরা ঘৃণা করে যাকে এককালে ভালবেসেছে। আমি বলেছিলাম আমি করি নি। মনে মনে বলেছিলাম আমি করি না। মনে মনে বলেছিলাম। আমিও তো করলাম। তাহ'লে আমি ভুল বলেছি। না, আমি ভুল বলিনি। কেন অসীম আবার ফিরে এল? স্বপ্নময় অতীত হয়ে দূরে রইল না? যা মরে গিয়েছে, তাকে জাগাবার চেষ্টা করল কেন? প্রথম পূর্ব্ব-প্রেমের, প্রথম প্রেমের স্মৃতি মোহে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু, কুকুরের মত পিছনে ফিরে আমাকে উত্যক্ত করে তুলল। একান্ত দীন, মিথ্যাকুণ্ঠিত সেই প্রেম আমার কাম্য ছিল না। আমি চাইতাম সবল, সুস্থ ভালবাসা, জগতের মধ্যে যে নিজেকে ঘোষণা করতে পারে অসঙ্কোচে। ইন্দ্রজিৎ সেই ভালবাসা তুলে ধরল চোখের সামনে। বুঝলাম অসীমের প্রেম কতটা হীনতা-লাঞ্ছিত। ঘৃণা করলাম। ভুলে গেলাম।

ইন্দ্রজিৎ! একটা বিবাহ বাটীতে ইন্দ্রজিতের দেখা পাই। আলাপ হ'ল। আমার অভিভাবকেরা দেখলেন পরমসুন্দর সুপাত্র। ভাবলেন মেয়ে বিয়ে করতে চায় না, যদি এর সঙ্গে মিশে মত পরিবর্ত্তন হয় মন্দ কি? নিবিড় আলাপে বাধা দিলেন না।

কেন কবিতা লেখা ছেড়ে দিলাম! রূপালী নরম গালিচার ওপর ইতস্তত মত্ত পাদচারণ করতে লাগল। আমি গেয়ে যেতাম যৌবন ও প্রেমের গান, যার জন্ম হ'ত মানবহৃদয়ের আদিম রোমান্টিক্ প্রবৃত্তি থেকে। যে মানুষ অন্তরের অন্তস্তলে চিরপ্রেমিক, যে তারুণ্যের অবসানে ক্ষুব্ধ হয়, যার স্বপ্ন চির দিন উর্দ্ধমুখী, তার সঙ্গীত হ'ক রক্তগোলাপের মত বাসনা-রঙীন, সুরার মত আবেশ-মদির। Decadent Poets! জানি আজকালকার প্রচলিত কাব্য তাই। কিন্তু, সমাজ যেখানে সত্যিই ডিকাডেন্ট, সেখানে তাদের ভুলিয়ে দিতে হবে বর্ত্তমান, যা তারা পায়নি অথচ চেয়েছে তারই সঙ্গীত রচনা করতে হবে। সে সঙ্গীত কাঁপবে হৃদয়ের তারে তারে। সে হৃদয় চায় চিরদিন—প্রেম ও স্বপ্ন!

হায় আমার আমি! আমার জীবন-আখ্যান শুনে সকলে আমাকে কি ভাববে? কিন্তু লাম্পট্য আমার ইপ্সিত ছিল না, ছিল প্রেম। নরক আমার জন্য মুখ ব্যাদান করে আছে হয়তো। কিন্তু নরকগমনের পূর্ব্বে চাই মুখোমুখী দাঁড়াতে দণ্ডদাতার সম্মুখে। প্রতিটি প্রেমকাহিনী আমার প্রেমের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারুর কোন ক্ষতি আমি করতে চাইনি। চেয়েছিলাম চিত্তের অপরূপ বিলাস—

"ফুলের যা দিলে হ'বে নাকো ক্ষতি, অথচ আমার লাভ!"—

তাই চেয়েছিলাম ভালবাসার পাত্রের কাছে। কোন বন্ধন দিতে চাইনি। কখনও ঈর্ষাসন্দেহে তাদের জর্জ্জরিত করে তুলতাম না। অনন্ত প্রেমের নিদর্শন আমার কাম্য ছিল না। বহুকামী যে পুরুষ তাকে আমি দেখতাম অপ্রাপ্তবয়স্কের দোষত্রুটী ক্ষমার দৃষ্টিতে। চরম আত্মদান যার কাছে করলাম না, সে অন্যদিকে গেলে তাকে অভিযোগ দেবার কিছু নেই। আর, আমি তো জানতাম পুরুষ অন্যমুখী হ'লেও আমি তার মনে প্রথম, শ্রেষ্ঠ। যে হৃদয় আমার করতলগত, অন্য নারী যদি তার কণামাত্র ভিক্ষা পায়, ক্ষতি কি ?

আমার জন্য যদি কারও ক্ষতি হয়ে থাকে সে দোষ আমার নয়। আমি স্বেচ্ছায় কারও ক্ষতি করতে চাই নি।

সকলে বলে আমি ভুল করেছি বেশী উদারতা দেখিয়ে। পুরুষকে চোখে চোখে রাখতে হয়। হয়তো হয়, কিন্তু সকলকে নয়। ইন্দ্রজিৎ তার মধ্যে একজন। কিন্তু সে-ও চাইত বন্ধন আমার কাছে। কিন্তু স্বভাব যে আমার তার অনুকূলে ছিল না।

আজ ইচ্ছা করছে সমস্ত আধুনিকাদের ডেকে আনি এই ঘরে, আমার চতুষ্পার্শ্বে। রাত্রি শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারার মালা ম্লান। ঘড়ি প্রহর ঘোষণা করে গেল—সাড়ে চার। রাত্রির অন্তে আমার নিজরূপ ফিরে আসবে। ফিরে আসবে সিণ্ডেরেলার ছিন্ন বস্ত্র, কুমড়ো ও ইঁদুর। সোনার পাখা মেলে পরী অন্তর্হিত হ'বে যাদুদণ্ড নিয়ে। আজকের এই বিনিদ্র রাত্রি জীবনে আর ফিরে আসবে না। প্রভাত আমার কল্পনায় ছেদ টানবে, স্মৃতিকে হত্যা করবে! কিন্তু এখনও, এখনও আমি সাম্রাজ্ঞী। সহস্র প্রেমের আখ্যায়িকার নায়িকা আমি একা। আজ তোমরা বিগতযৌবনা, শীর্ণ-ক্লিষ্টা আমাকে দেখ অনুকম্পার দৃষ্টিতে। কিন্তু একদা আমার জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ চির জাগরূক ছিল। সে উৎসবমুখর জীবন তোমাদের

সঙ্কীর্ণ কল্পনায়, অপরিসর ধারণায় ধরা অসম্ভব। আজ তাই ইচ্ছা করছে বলে দেই তোমাদের সারা জীবনের অভিজ্ঞতার ফল। তোমাদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তুলি। সরলা, অবলার যুগ শেষ হ'ক। যে সব ভুলে আমি করেছি সে সব ভুল তোমাদের হ'বে না। প্রেমের রণাঙ্গনে তোমাদের আয়ুধ হবে অমোঘ।

শোন আধুনিকারা, পুরুষকে কখনও বিশ্বাস কর না নির্ব্বিচারে। কিন্তু ঘূণাক্ষরেও তাকে জানতে দেবে না এই অবিশ্বাস। নিজের অধিকার বিস্তার কর নীরবে, সহজে, যা সে ও বুঝতে না পারে। বুঝতে পারলে সাবধান হ'বে। বাহিরে তাকে তাই প্রাধান্য দেওয়া চাই, তা সে যতই কেন না কৃপার পাত্র হ'ক। কৃপার পাত্র হ'লেও পুরুষ ভিন্ন নারীর দিন আরও অচল! সুতরাং মনে রেখ, তুমি তার বেশী প্রয়োজনীয়, সে তোমার যতটা তার চেয়ে।

মনে রেখ, পুরুষ প্রেমের জন্য কষ্ট সহ্য করতে ভালবাসে। দাও, দাও তাকে যন্ত্রণা, কষ্ট, কঠিন হয়ে। দিনকে রাত করে তুলবার আদেশ জানাও, সন্ধ্যাকে প্রভাত। ব্যথার মধ্য দিয়ে যে পাওয়া, সেই পাওয়ার মূল্য দেয় সকলে। অসম্ভব-সাধনায় তার প্রেমকে কৃতার্থ হ'তে দাও।

খেলা কর তাকে নিয়ে ; কিন্তু যেটুকু দেবে সেটুকু, যত কম সময়ের জন্য হ'ক, খাদ মিশিয়ে দিও না।

ক্রোধে নিজেকে হারিয়ে ব'স না। নির্লিপ্ত ঔদাসিন্য সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক হবে। ক্রোধে তোমাকে বিগতশ্রী দেখাবে, ধরা পড়ে যাবে বড় বেশী ভালবাস। সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে না দিয়ে কিছু ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় রাখ। তার জন্য সঞ্চয় রেখ তোমার প্রেম। আর তোমার জন্য সঞ্চয় রেখ অন্য পুরুষের প্রেম। এক নিষ্ঠাকে পুরুষ বিবাহ করতে চায়, কিন্তু মোহ তার ক্লিওপ্যাট্রার

উপরেই! বাংলা দেশেও শেষ হয়ে গেছে সত্যবান ও শিবের যুগ। নারী আজ বন্দিনী নয়, তার লীলাবিভ্রম চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত। তাই নিজের লোকটিকে রাখতে হ'লে তোমারও শিখতে হবে তাই। শিখতে হবে বুদ্ধি গোপন করে সারল্যের, ছেলেমীর অভিনয়। শিখতে হবে অন্তরের দহন চেপে রেখে বঙ্কিম কটাক্ষ। শিখতে হবে নির্ব্বোধ পুরুষের তোষামোদপ্রিয় প্রকৃতির বন্দনা। আর শিখতে হবে—

রূপালী, আর বোল না। ওদের মাথাটি ভক্ষণ কর না। চুপ কর।

প্রেম কৌশলপ্রয়োগ করে করা চলে না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় টেক্‌নিক হচ্ছে কোন টেকনিকই ব্যবহার না করা। স্বচ্ছ, মোহশূন্য দৃষ্টি, বুদ্ধিপ্রদীপ্ত মুখচ্ছবি, নিবিদ্ধ অন্তর—এই আধুনিকাদের সঙ্গে ভালবাসার কসরৎ করতে ভয় হয়, মনে হয় আমার সামান্য দুর্ব্বলতাও এর দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না। এখনি বুঝি শাণিত অধরোষ্ঠ বিদ্রূপহাস্য ঝলসিত হবে। এইজন্য, চব্বিশের রূপালী তোমাকে পুরুষ অন্তরের কথা বলতে সাহস পেত না। যারা তোমার জন্য অধীর হয়ে উঠত, তারা বাহিরে সভয়ে নিজেকে দমন করে গেছে। তোমার তখনকার রূপ মনে আছে? বসবার ঘরে ঢুকলে তুমি তিন-ইঞ্চি উচ্চ কাল কোর্ট স্যু-এর ওপরে সবল, নিশ্চিত পদক্ষেপে। অঙ্গে তোমার অতি সূক্ষ্ম কাল গরদের শাড়ী, সরু রূপালী পাড় তার কাঁধ থেকে কটি পর্য্যন্ত তরবারীর উজ্জ্বলতায় আস্তৃত। হাতাশূন্য কাল মখমলের জামার নিম্নে দৃঢ় বাহু। কানে তোমার হীরার ফুল। আভরণহীন সর্ব্ব অঙ্গ নিপুণ ভাস্করের মনোযোগে নির্ম্মিত। জড়ি-গাঁথা দীর্ঘ বেণী তোমার জানুর কাছে দোল খাচ্ছে সর্পের কুটিলতায়। হাতের রূপার-তারে-গাথা হাত-ব্যাগ্ নামিয়ে আগন্তুক যুবকদের দিকে চেয়ে হাসলে। ইস্পাতের

প্রখর হাসি। গলার স্বরে নিশ্চিন্ত সহজতা—এই যে, খবর কি ?

সঞ্জীবকে হয়তো ভালবেসেছিলে। এম-এ ক্লাসে তোমার সহপাঠী। সব কিছু তার সুন্দর। সে-ও তোমাকে কিছু বলেনি, নীরবে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল। যতটা চেয়েছিলে ততটা পাওনি তাকে, বসে আজও তার সম্বন্ধে কৌতূহল রয়েছে তোমার। তোমার প্রণয়ীদের মধ্যে একমাত্র সেই বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে দূরে সরে যেয়ে— যখন তার ওপরে তোমার কৌতূহল প্রবলতম, আকর্ষণ প্রখরতম।

কেন সে চলে গেল। অধীর হয়েছিলে তার বিবাহ করে বিদায় না নিয়ে কোয়েটা যাবার খবর পেয়ে। অশ্রু আপনি চক্ষে এসেছিল। কিন্তু সে অধ্যায়ে দাঁড়ি দিয়েছিলে তুমি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে ধরে রাখার হীনতা তোমার ছিল না। তার নববিবাহিতা, প্রেমবিহবলা পত্নীর কথা ভেবে চিঠি লিখতে যেয়ে লেখনি। মানসিক উদারতা তোমার অতটা ছিল।

সে চলে যাবে না ? মনে নেই সে বন্ধুর সঙ্গে প্রেম নিয়ে কি বিশ্লেষণ করে গেলে তুমি ? নিছক ন্যাকামী বলে অমর প্রেম-উপাখ্যানদের উড়িয়ে দিতে। পুরুষের দুর্ব্বলতা নিয়ে বিদ্রূপহাস্যে শতধা হ'তে। চীৎকার করে ভেঙ্গিয়ে কালিদাসের অগ্নিমিত্রের আক্ষেপ পড়েছিলে ঃ—

“শরীরং ক্ষামং স্যাদসতি দয়িতালিঙ্গনসুখে
ভবেৎ শাস্ত্রং চক্ষুঃ ক্ষণমপি ন সা দৃশ্যত ইতি।
তয়া সারঙ্গক্ষ্যা ত্বমসি ন কদাচিদ্বিরহিতং
প্রসক্তে নির্ব্বাণে হৃদয় ! পরিতাপং ব্রজসি কিম্ ॥”

হেসেছিলে—দেখ সঞ্জীব, অগ্নিমিত্রের অবস্থাটা। বড় যেন বাড়াবাড়ি লাগে। এতগুলি অন্তপুরচারিনী থাকতেও মালবিকার

জন্যে পাগল! কারণ, মালবিকা তরুণীতমা। ছেলেদের বেশ চিনি আমি। একরকমের কথা সকলের, একরকমের ব্যবহার। জান সঞ্জীব, এক এক সময়ে আশ্চর্য্য লাগে, মনে হয় একখানা বই দেখে সকলে কথা মুখস্থ করেছে। মনে হয়, একত্র পরামর্শ করে ব্যবহার শিক্ষা করেছে। ভাবে যে ওসব বুঝি না। তারপর বলেছিলে সেই ভয়ানক কথাটি—বিয়ে করতে আপত্তি করতাম না, যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন এদেশে থাকত। একজনকে নিয়ে সারাজীবন, ওরে বাবা! পাউডার-নীল জামার কাঁধ আন্দোলিত করেছিলে হেসে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে সঞ্জীব বলেছিল, তুমি তাহ'লে একনিষ্ঠ ভালবাসায় বিশ্বাস কর না?

অবলীলাক্রমে বলেছিলে, ওরকম কিছু নেই। আমি কি চাই জান? বলেছিলে সেই মারাত্মক কথা—

"ফুলের যা দিলে হবে নাকো ক্ষতি, অথচ আমার লাভ।"

হায়, রূপালী, হায়! কোথায় গেল সেই নীলাম্বরী-জড়ান খেল ফুলের মালা-পরা মেয়েটি, যার বয়স ছিল সপ্তদশ, যার কাল চোখে ছিল স্বপ্ন? সে কি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তোমার জীবনে? সে কি কবরচাপা পড়েছিল তোমার শিক্ষাদীক্ষার আবর্জ্জনায়? না! তোমার মধ্যে চিরবিনিদ্র জেগে ছিল সেই সপ্তদশী প্রেমিকা! নির্নিমেষ সে লক্ষ্য করে যেত পুরুষের, যাকে ভালবাসে সে, তার প্রণয়জ্ঞাপনের চিহ্ন। কিন্তু ভুল করতে। প্রেম করতে যেতে আগে বন্ধুত্ব করে বসতে। মনের সমস্ত কথা উজার করে দিতে, গর্ব্ব দেখিয়ে হৃদয়হীনতা প্রমাণ করতে। ফলে পুরুষ তোমাকে দেখে ভয় পেত। তাই বলেছি, ভুল তোমাদের হয়।

সঞ্জীবকে ভালবেসে ফেললে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে একত্রে। প্রথমে চেয়েছিলে মনটাকে অন্যত্র কিছু দিতে। ইন্দ্রজিৎ দীর্ঘদিন তোমার জীবনে ছিল। অহঙ্কার হয়েছিল তার সহস্র নারীর পূজার্ঘ্য পেয়ে পেয়ে। ভেবেছিলে হয়তো তুমিও তার মধ্যে একজন। তুমিও ভালবেসেছিলে তাকে। কিন্তু সে প্রেমে খাদ ছিল। দৈহিক সৌন্দর্য্যকে তার তুমি বেশী ভালবেসেছিলে। বেসেছিলে তার দেহ, উষ্ণ, আরামদায়ক। সে ছিল তোমার নেশা, জলবায়ুর ন্যায় প্রয়োজনীয়। প্রেমের কাছে তাই হার হ'ল তোমার। খেলা করতে গিয়েছিলে ইন্দ্রজিতকে নিয়ে প্রথমে। সকলের কাছে এ যেন ছিল তোমার বিজয়-যাত্রা। কিন্তু, অবশেষে খেলা যে জীবন-মরণ ক্রীড়া হ'ল। ইন্দ্রজিৎ ভুল করল নেশাকে আসল বস্তু মনে করে। তাই বিবাহপ্রস্তাবে বিলম্ব করতে লাগল, তোমাকে নিয়ে খেলা সে-ও করতে চাইল। তখন তুমি ছিলে উন্মত্ত, ব্যাকুল। তাকে সম্পূর্ণভাবে পাবার জন্য বিবাহ করতেও প্রস্তুত ছিলে তুমি।

চব্বিশ উত্তীর্ণ প্রায়। বাড়ীতে অশান্তি হয়েছে তোমার বিবাহ নিয়ে। পিসীমাসীর দল ব্যাকুল। পড়শীরা নিন্দামুখর। ঠাকুর-মায়ের আর্ত্তনাদ। মাতার গঞ্জনা। বাঙালীর মেয়ে, চব্বিশ গেল যে!

ভুল হয়েছিল তোমার ওই সঙ্কীর্ণ, কঠিন সমাজে জন্মগ্রহণ করে। অত মুক্ত চিত্ত শোভা পায় না ও সমাজে। বিবাহ তোমার হচ্ছে না সে কি তোমার দোষে? তোমার দোষে, কিন্তু তার ওপরে তোমার হাত ছিল না। দোষ তোমার নির্ম্মাণকর্ত্তার।

ছোটভাই রূপেন মদ ধরেছিল। সে যন্ত্রণার ওপরে গলায় অতবড় মেয়ে। তোমার জীবন সকলে উত্যক্ত করে তুলল। শিল্পীর কোমল মন—সামান্য কথাতেও আঘাত লাগে বেশী। ইন্দ্রজিতের হাতে মুক্তির চাবিকাঠি। Sesame open the door—আর খুলে যাবে দ্বার কত ঐশ্বর্য্যের চিত্র দেখিয়ে।

প্রতীক্ষা করতে, অধীর প্রতীক্ষা। একবার বিবাহ করতে বললেই করবে। কিন্তু বলে না সে। ভেবেছিল করতলগত সাম্রাজ্য। বুঝেছিল তোমার প্রতীক্ষা, কারণ বোঝেনি। সে তোমার পাণি শুধু চায়নি, চেয়েছিল তোমার মন সর্ব্বতোভাবে। তাই সে-ও প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু তার প্রতীক্ষার রূপটি তোমার চোখে পড়েনি, পড়েছিল তার খেলার রূপটা।

কৌশল আশ্রয় করতে হ'ল। সঞ্জীবের দিকে দৃষ্টি দিলে চিত্তের ভারসাম্য রক্ষার জন্য। নিজের টেক্‌নিক নিজে গ্রহণ করলে। কিন্তু টেক্‌নিক ধরে প্রেম হয় না। অন্তর যে কোন নিয়ম-চাতুর্য্যের বন্দীত্ব স্বীকার করে না। সঞ্জীবকে ভালবেসে ফেললে, আবার প্রেমের কাছে হার হ'ল। তাই বুঝতে পেরে ইন্দ্রজিৎ হ'ল উচ্ছৃঙ্খল। কয়েকটি জীবনে এল ট্রাজেডি। সমস্ত ব্যাপারটা অঙ্কশাস্ত্রের মত জটিল, কিন্তু উত্তর বের করা যায় কষে।

খাতার পাতা গেল খুলে, বার হ'ল ইংরাজি-বাংলা-জড়ান জীবনেতিবৃত্তি। আলোর নীচে রূপালী নীলপাতা সরিয়ে দেখল ধরে।

রূপালীর ডাইরি—(পঁচিশ বছর বয়সে)

"Stillness reigns everywhere. It seems to shut up everything from future, from the past. The present too, is blurred. Darkness is on the face of the earth.—Darkness within, without—! নারীর জীবনে ট্রাজেডী সে ভাল না বেসে থাকতে পারে না। হাস্যকর আবার এই যে, এই প্রেমপাত্র পুরুষ হ'বে, অন্য কিছু নয়। শিশু নয়, অন্য নারীও নয়। জানি প্রেম নিয়ে বিশ্লেষণ না ক'রে তাকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা সুখের উপায়। কিন্তু পারি না। মনে হয়

কেউ আমাকে ভালবাসে না। দিয়েছি অনেক, পাইনি। অদ্ভুত জীব ব'লে অনেকে কৌতূহলী হয়েছে মাত্র। লোকে ব'লে আমি অহঙ্কারী, কঠিন। নিজের আহত হৃদয়কে আবৃত করবার এই প্রকৃষ্ট উপায়।'—১১ই নভেম্বর।

'I even cannot write poems any longer. Nothing can stir me now. Who has taken away my joy in life? Indrajit? He is happy and gay. আমি প্রতারিত হয়েছি। কিছুতেই বিশ্বাস নেই। ঈশ্বর, তোমাতেও না।'—১৬ই নভেম্বর।

'Pick up my heart and trample on it. দূরে থেকে কেন আমাকে এ ভাবে প্রলুব্ধ ক'রছ? এ হৃদয়হীন খেলা আর খেলতে পারছি না। আমি ক্লান্ত। I am defeated'—১৬ই ডিসেম্বর।

মন ছিল রূপালীর চির নিঃসঙ্গ। জনতার মধ্যেও সে মন একাকী থাকত। ডাইরি লিখে মনোভাব লাঘব করবার ছেলেমী তার চিরদিন ছিল।

ওঃ, বড় কষ্ট পেয়েছে পঁচিশের রূপালী। স্নানের টাবের পাশ থেকে নীল ডোরা-টানা ভারী তোয়ালে তুলে নিয়ে অঙ্গ মার্জ্জনা করছে সেই মেয়েটি, যার ছবি কিছু পূর্ব্বে মুগ্ধমনে দেখা দিয়েছিল। রূপেন কাল অনেক রাত্রি ক'রে বাড়ী ফিরেছে, কলেজের বন্ধু নরম্যান্ উইলিয়ামস্ তাকে পৌঁছে দিয়েছিল ভাড়াটে ফীটনে। মত্ত প্রলাপ তার শুনে মা বিলাপ করেছিলেন অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে। একুশ বছরের নাবালক পুত্রের তাঁর একি হ'ল? সহসা

বড় মানুষ হয়েছেন তাঁরা। বোঝেননি অত্যন্ত বিলাস ও আরাম দিয়ে ঘিরে, হাতে বিপুল টাকার অঙ্ক তুলে দিলে দুর্ব্বলচেতার কুসঙ্গে পড়ে বিগড়ে যাওয়া স্বাভাবিক!

বাবা শাসাতে লাগলেন—হাণ্টার দিয়ে ঠিক করে দেবেন। বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও আবার পানীয় স্পর্শ করেছে সে। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে অতিকষ্টে ব্যবসাটি বজায় রেখেছেন। তাড়াতাড়ি বি-এটা পাস করে নিয়ে ছেলে কোথায় সাহায্য করবে, না রাতদুপুরে কেলেঙ্কারী। মা বিলাপ করতে লাগলেন ছেলের অসংযম নিয়ে, মেয়ের অনুঢ়ত্ব নিয়ে। দিনরাত্রি পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা, অথচ বিয়ে করে না। ভদ্রমহিলা মনেপ্রাণে কিছুতেই স্বামীপ্রমুখ পুত্রকন্যার আধুনিকত্ব সমর্থন করতে পারেননি কখন। ঘুম ভেঙে চাকরেরা বিস্ময়স্তম্ভিত নেত্রে আড়াল থেকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। কৌতূহলী প্রতিবেশী জানালা দিয়ে হাসছে। রূপেন শোবার ঘরে মেজেতে পড়ে চীৎকার করছে—Olga, Sweet! এস। পিতা সারা পল্লা সচকিত করে সিংহনাদ করছেন, মাতার নিশীথশান্তি ব্যাহত।

কি ঘৃণিত সে রাত্রি। অশান্তি চরম আত্মপ্রকাশ। সৌন্দর্য-পিপাসুর অন্তরমনে এ বেসুর রাগিণী সহ্য হয় না। এ জীবন পরিত্যাগ করে দূরে সে যেতে চায় চিরদিনের মত। সেখানে মাতার গঞ্জনাও তার কর্ণে প্রবেশ করবে না।

কোথায় যাবে সে? এম-এ পরীক্ষা দিতে পারেনি মানসিক বিপ্লবের জন্য। ইস্কুলে শিক্ষাদান ভিন্ন উপায় নেই। তাই বা কে দেবে? কার কাছে যেতে হ'বে, কি করতে হ'বে সে জানে না। তাকে অর্থকরী শিক্ষা দেওয়া হয়নি, হয়েছে অন্যের নয়নমণি সেজে থাকবার শিক্ষা। কিন্তু কার নয়নমণি হতে হ'বে তার সন্ধান দেওয়া হয়নি, আজও চলেছে সে সন্ধান।

"পাখী এল কুলায় আপন", "পাখী এল কুলায় আপন"।

সাময়িক শান্তিকে কোন কবি অন্তর্দ্বন্দ্বের চির অবসান ভেবেছিলেন? পাখী কুলায়ে ফেরে না, যদি সত্যই তার পক্ষ থাকে। রাজহংস সাময়িক ভাবে হয়তো মানস সরোবর স্পর্শ করে, কিন্তু সে একান্তই সাময়িক।

অল্‌গা সুইট, এস! ছিঃ, ছিঃ, পানশালার সঙ্গিনীকে সাদর আহ্বান মাতাপিতার সামনেই!

গত রাত্রির জ্বালাময় স্মৃতিতে স্নানের ঘরের মেয়েটির বক্ষে দহন এল। বিবাহ সে করবে এই নরক থেকে মুক্তি পাবার জন্য। আর মুক্তি পাবার জন্য নিজের সন্ধানী আত্মার কাছ থেকে। মুক্তি পাবার জন্য তনুভিক্ষা থেকে লুব্ধ পুরুষের। কত লোক আসে আকৃষ্ট হয়ে। তুমি তো হও না। তাই পঞ্চবিংশতির রূপালীর, খেলা জমে না। তোমার যে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে আখ্যায়িকার গোড়ার তুমি থেকে। বদলে গেছ তুমি। দ্রুত তোমার উত্থান হয়েছে। পুরুষের ওপরে তিলমাত্রও মোহ নেই তোমার, আছে প্রয়োজন। পৌরুষ তেজে বিহ্বল হ'বার মন তোমার নেই, তাই তোমাকে সম্যক বোঝা আর পুরুষের সাধ্যায়ত্ত নয়।

একটা গল্প শোন, আধুনিকারা,—আলোর নীচে রূপালী মনে মনে বলছে। আর দরকার নেই খাতার। খাতা বন্ধ করে সরিয়ে রাখল সে একপাশে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। রাত্রি প্রভাত প্রায়। সারা রজনী কেটে গেল নিদ্রাহীন চক্ষে।

—শোন মেয়েরা, একটা গল্প বলি। এক যে ছিল মেয়ে। সকলে তাকে বড় ভালবাসত। বড় ভাল সে। কত লোক আসে, তার কাকেও পছন্দ হয় না। মনে হয়, এ তো তার মনের

মানুষ নয়। ভগবানকে ভালবাসত সে। আকাশে চেয়ে প্রার্থনা করত; একবার যাকে চাই, চক্ষে দেখতে দাও শুধু। না হয় না-ই দিলে চিরদিনের জন্য। ভগবান শুনতেন না। জান না, ভগবান কখনও কার কথা শুনতে পান না? তারপর তার ওপরে রাজা আদেশ দিলেন—তোমার লোক খুঁজে নিতে হ'বে, নইলে যাও আমার রাজ্য থেকে বেরিয়ে। ভয় হ'ল তার। রাজ্যের বাইরে আশ্রমে যেয়ে নীরস ব্রহ্মচর্য্য ধাতে সইবে না। হাতের কাছে দেখল একটি লোক। ইন্দ্রজিৎ। সকলকে জয় করেছে কিনা। মেয়ে ভাবল মনের মানুষ নাই হ'ক, ওকেই নেব। ইন্দ্রজিতের কিন্তু মজা লাগল। তার তো কোনও রাজার দণ্ডের ভয় ছিল না। খালি সময় নষ্ট করে, মেয়েকে নিয়ে খেলা করে, কষ্ট দেয় তাকে। সে ঠিক করল অন্যদিকে মন দেবে, তাহ'লে ইন্দ্রজিৎ জব্দ হ'বে। এল সঞ্জীব। তাকে হয়তো সত্যই ভালবাসত মেয়ে, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ যে তারই চোখের সামনে অন্য মেয়েকে নিয়ে মেতে উঠল। চুপ করে সহ্য করে থাকবার মেয়ে সে নয়। জ্বলে উঠল মেয়ে, ফলে হ'ল একটি বিয়োগান্ত গল্প। আমার কথাটি ফুরাল।—

মনের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল রূপালীর—অন্য মেয়ে। সেই লাস্যমদিরা নন্দা! ইন্দ্রজিতের আবাল্যবন্ধুর ভগ্নী, ইন্দ্রজিৎকে 'ইন্দ্রদা' বলে ডাকত। শ্যামবর্ণের ওপর অপরূপ সুন্দরী ছিল সে। ঈষৎ স্থূল পরিপূর্ণ দেহে যৌবনের সমস্ত মাদকতা উচ্ছল। সুর্ম্মাটানা, কাল চোখে প্রগাঢ় মাতাল দৃষ্টি। গাঢ়রক্ত, পূর্ণ-অধরোষ্ঠ, কামনার বাসা যেন। রূপালীদের কলেজে পড়ত আগে। বিদ্যায় ইতি দিয়ে বাড়ীতে খেয়াল গান শিক্ষা করছে। তাদের অবস্থা ভাল নয়, ইন্দ্রজিৎ স্বজাতি। তার বাড়ীশুদ্ধ

সকলে ইন্দ্রজিতের বন্ধনকার্য্যে রত হ'ল। মায়ারূপিনী ছিল নন্দা নিজে, বিভীষণ তার ভ্রাতা, ইন্দ্রজিতের বন্ধু।

ইন্দ্রজিৎ যেত সেখানে মাঝে মাঝে। অত আদর যত্ন ভালই লাগত তার। বন্ধুও ছিল সে বাড়ীতে। নন্দার আবেশজড়িত কথাবার্ত্তার ভাব বুঝে মনে মনে হাসত, তবু সময় কাটাবার জন্য নন্দার সঙ্গে খেলা করে যেত।

প্রথমে কথাটা শুনে রূপালী বিশ্বাস করেনি। রূপালীর একনিষ্ঠ সাধকের যে খেলাচ্ছলেও অন্যমুখী হ'বার প্রবৃত্তি আছে, সে তা বোঝেনি। শাসন ছিল তার স্বভাবের বাহিরে। আর শাসন ইন্দ্রজিতকে আরও বিদ্রোহী করত। তার মত পুরুষ চাইত চরম আত্মদান—সেই একমাত্র বন্ধন তার প্রেমের। ইন্দ্রজিতকে বাধা দেয়নি রূপালী আলিঙ্গন করতে, চুম্বন করতে। কিন্তু আত্মদান কখনও হয়নি। প্রথম দিন সে চুম্বন করেছিল রূপালীকে এক বছরের আলাপের পর। কোনও মত চায়নি, সহজ ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে চুম্বন করেছিল। দীর্ঘ, বাসনাময়, উত্তপ্ত চুম্বন—অধরে।

জীবনে প্রথম চুম্বন ভাল লাগেনি রূপালীর। বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত অনভ্যাসের ফলে স্বপ্নদেখার চুম্বন বাস্তবে মিলল না। কিন্তু বাধা দেয়নি রূপালী। যেরকম অখণ্ড কৌতূহলে মোহিতের সাহস পরীক্ষা করে যেত, তেমনি ভাবে সে ইন্দ্রজিতের আদর গ্রহণ করত। দেখি কি হয়, এর পরে আর কি আছে? কণ্ঠে চুম্বন ভাল লাগে, বাহুতে বা কেমন দেখি। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য জেগে থাকত, চিত্ত এক হয়ে যেতে পারত না ইন্দ্রজিতের ঘনস্পন্দিত প্রশস্ত বক্ষের ওপরে। তাই ইন্দ্রজিৎ হ'ল উন্মাদ—ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে দিয়ে রূপালী তাকে তৃপ্ত করল না। নন্দার বাড়ী যেতে হল রূপালীকে ভুলতে। রূপেনও যেত নন্দার ভাইঝি রত্নার আকর্ষণে।

সমস্ত খবর পেত রূপালী রূপেন ও রত্নার মুখে। দুই একবার নিজের চোখেও দেখেছে সে। ওই রকম সাধারণ একটা তৃতীয় শ্রেণীর দেহসর্ব্বস্ব মেয়ে! আত্মসম্মান নেই কিছুমাত্র! ইন্দ্রদা, শুনুন। কাল কিন্তু আপনার গাড়ীতে বোটানিক্সে নিয়ে যেতে হবে!—সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে বিহ্বল কটাক্ষ। আরক্ত অধরের ভাষাহীন বিনতি।

আর, ওই মেয়েটির আবার খোঁপা খুলে, হাত ধরে টেনে, গালে হাত দিয়ে আহ্লাদ করছে ইন্দ্রজিৎ! কিছুমাত্র সংযম নেই।

রোহিণী আগরওয়ালা বেড়াতে এল। ভাই রুলি, সেই আমাদের কলেজের নন্দা মেয়েটা ছিল না? তাকে দেখলাম লেকের ধারে তোর বন্ধু ইন্দ্রজিৎ রায়ের হাত ধরে বেড়াতে। কি ঢলাঢলি করছে দুজনে! ওদের বিয়ে হবে নাকি?

বিবর্ণ মুখচ্ছবি গোপন করে রূপালী অগ্রাহ্যের ভাবে উত্তর দেয়—না, বিয়ে হবে কেন? দাদার বন্ধু, তাই। একটু বেড়ালে কি হয়? তোমাদের খুব সন্দেহের মন।

নিজেকেই যেন বোঝাল রূপালী। জপ করতে লাগল, সন্দেহ করব না। আমি ছোট হ'ব না। নন্দা অতি সাধারণ, ভয় ছিল না রূপালীর। কিন্তু অসাধারণত্ব ইন্দ্রজিতকে কক্ষচ্যুত করেছিল, সাধারণের পর্য্যায়ে নেমে সে স্বস্তি পেত।

ইন্দ্রজিৎ চাইত রূপালীর ক্রোধ, অনুযোগ। দূর থেকে রূপালীকে দেখিয়ে স্বীকার করবে রূপালী—আমি তোমাকে ভালবাসি। বিবাহের জন্য কিয়ৎপরিমাণে প্রস্তুত ছিল রূপালী, কিন্তু ধরা দেয় নি। ভাল সে এমন বাসেনি ইন্দ্রজিৎকে, যাতে আত্মসমর্পণ করতে পারে। চিরজীবন ওই ইন্দ্রজিৎ দেহসর্ব্বস্ব প্রেম চায়, কল্পনার প্রসার নেই, গ্রীক নাটক কি সে জানে না!

কিন্তু উপায়ান্তর নেই। জনারণ্যে কাকে খুঁজে বেড়াবে চিরদিন এক কূল থেকে অন্যকূলে স্রোতের বেগে? ঈর্ষা সে দেখাত না। ঈর্ষা তার হ'ত না, হ'ত অপমান। অন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রেমকে নিতে হ'বে তার? রূপালা লাহিড়ীর, কলেজের ছেলেরা আজও যার নামে সতেজ হয়ে ওঠে? মুখে অবহেলা দেখাত রূপালী অন্তর্নিহিত চাপা ক্রোধের প্রাবল্যে। ইন্দ্রজিৎ আরও অধীর হ'ত। ক্রোধ রূপালী দেখাত না। প্রেমকে নিয়ে খেলা করে করে একটা শিক্ষাপটুত্ব এসেছিল তার। রূপালীর প্রয়োগ-কৌশলে ক্রোধ দেখান নিষেধ।

আবার ভুল করল রূপালী। অপমানবোধ অন্যরূপ নিল, এল সঞ্জীব। প্রথমে খেলা, শেষে প্রাণদান। অস্বস্তি হ'ত, এ কি দু'জনকে একত্রে ভালবাসছে সে! আগে বহুকে একত্রে ভালবেসে এ দ্বিধা মনে জাগত না। কিন্তু রূপালীকে সমাজ-শাসন কিছু পরিবর্ত্তিত করেছিল বোধহয়। কি হ'বে এর শেষ? কাকে বিয়ে করব? হায়, কাকে আমি ভালবাসব?

কল্পনায় ভেসে আসত—শুভ্র শয্যাশায়িতা সে, একপার্শ্বে ইন্দ্রজিৎ অন্যপার্শ্বে সঞ্জীব। ইন্দ্রজিৎ যৌবন-বিহ্বল, তরুণ গ্রীক-দেবতা। সঞ্জীব ধীর শান্ত, পরিণত পুরুষ। একের কাছে মেলে আনন্দ, অন্যের কাছে আশ্রয়।

ইন্দ্রজিৎ অস্থির হয়ে উঠল রূপালীর চিত্তবিভ্রম অনুভব করে। আর রূপালী চুম্বন ভালবাসে না কত অনিচ্ছায় যেন বাহুবন্ধনে ধরা দেয়। প্রতিচুম্বনে তার মত্ততা নেই, চিত্তের অন্য অর্দ্ধেক অপরের পিছনে ফিরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং ইন্দ্রজিতের আশ্রয় নন্দা!

আহা, সব সময় টানাটানি ভাল লাগে না।—হাত ছাড়িয়ে বলল রূপালী। সে রত্নার মুখে শুনেছে ইন্দ্রজিতকে নন্দাকে

চুম্বনরত অবস্থায় দেখা গিয়াছে। এ বিষয়ে কিছু বলবে না সে ইন্দ্রজিতকে, আত্মসম্মান আছে তার। শুধু ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দেবে রূপালী নন্দা নয়, জলের মত তার চুম্বন সস্তাও না।

আহা, হাত ছাড়ো।—কিন্তু দৈহিকশক্তির জয় ঘটল, ইন্দ্রজিতের আলিঙ্গনে সেদিনও ধরা দিতে হ'ল। কলুষিত যে অধর স্পর্শ করবে না ভেবেছিল রূপালী, সেই অধরে চুম্বন ফেরত দিতে হ'ল। কি সে করবে? মুক্তি নেই তার। খেলা আরম্ভ করে চলে আসতে গেলে অন্য খেলুড়ী ছাড়বে কেন? আর সবচেয়ে বড় কথা—অভ্যাস হয়েছিল রূপালীর। নেশা ছাড়া বড় কঠিন।

মুক্তি পাওয়া মাত্র রূপালী সরে এল অন্য আসনে। পূর্ণদৃষ্টি মেলে ইন্দ্রজিতের উত্তেজনা-আরক্ত, অপরূপ সুন্দর মুখের প্রতি চেয়ে রূপালী বলল, এত বিরক্ত কর কেন আমাকে? তোমার সঙ্গে এমন করা উচিত নয় আমার! তোমাকে তো আমি বিয়ে করব না।

আশা করেছিল সে, ইন্দ্রজিৎ ব্যাকুল হয়ে কারণ শুনে ক্ষমা চাইবে। ইন্দ্রজিতকে বিবাহ করতে প্রস্তুত ছিল সে নিরাসক্ত চিত্তে, কারণ সঞ্জীব এখনও বন্ধুর পর্য্যায়ে রয়েছে। কিন্তু ইন্দ্রজিতের দৈহিক প্রেমের কিছু পরিচয় ঘটেছে তার। একটা নৈতিক বন্ধন যেন স্থাপিত হয়ে গেছে। হায় রূপালী।

আজ ইন্দ্রজিত সে কথা তুলল না। পকেট থেকে চিরুণী বা'র করে বিশৃঙ্খল কেশ অপসারিত করতে করতে যেন পরম তাচ্ছিল্যে উত্তর দিল—কেই বা তোমাকে বিয়ে করবার জন্য সাধছে?—একটু পরে চুরোটীকায় অগ্নিসংযোগ করে জিজ্ঞাসা করল ঔদাস্যের ভঙ্গিতে, কাকে বিয়ে করবে শুনি? ওই গোল-মুখো সঞ্জীবকে?

জ্বলে উঠল রূপালী, এতক্ষণ এই ঔদাস্যের অভিনয়ে ফুলছিল

ভেতরে। তীরবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—যাকেই হ'ক সে তুমি যথাসময়ে জানতে পারবে। কার্ডে নামতো ছাপান হবে।

এগিয়ে আসল রূপালী ইন্দ্রজিতের কাছে। গলার স্বরে তীব্র ঘৃণা ঢেলে দিয়ে রূপালী চরম ভৎ'সনা করল তার একান্ত দুর্লভ প্রেমিককে।

সেই তোমার শেষ বিজয়, রূপালী লাহিড়ী। ভাল করে দেখি তোমাকে! গাঢ় রক্ত বস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গে তারার মালার মত জড়ির ফুল। দেহ কম্পিত, মসৃণ কপোল আবীরলাল।

তোমাকে কখনও বিয়ে করব না, এইটা জেনে রেখ। তোমার ওসব আমাকে জ্বালিয়ে মারে। তুমি আমার গায়ে হাত ছোঁয়ালে আমার ঘৃণা হয়। তোমার মুখে মুখ লাগানর চেয়ে মরাও ভাল। তোমাকে আমি ঘৃণা করি।

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়িয়েছে এতক্ষণে। রক্তলেশবিহীন মুখ ফিরিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, আমি জানতাম না এ কথা। জানিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ।

তারপর—নন্দা।

শেষ হ'ল জীবননাট্যের! এবারে সাধারণ সহজ যাত্রা। সঞ্জীব চলে গেল। বিবাহ করতে হ'বে? দিন কাটে না পুরুষ-সাহচর্য্য বিনা। ইন্দ্রজিতের প্রেম-করা স্মরণে শিহরণ আনে। দেহ জেগে উঠে চায় তৃপ্তি। কামনাকে জাগান হয়েছে প্রেমের উপচারে। এখন তাকে খোরাক দাও। সুতরাং বিবাহ।

ইন্দ্রজিৎ কোথায়? সে বিবাহ করেছে সেই নন্দাকে। স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে। আইন, সমাজ ছিল নন্দার পক্ষে। সে কালরাত্রিকে ভুলবার নেশায় ইন্দ্রজিৎ যে সমস্ত ভুলেছিল।

ওঃ! রূপালী, আজও কি তোমার চোখে জল? আজও কি তুমি কাঁদবে সেদিনের মত? যেদিন প্রথম সংবাদ পেলে ইন্দ্রজিতের দুরদৃষ্টের? নন্দাকে ঘৃণা করত ইন্দ্রজিৎ। পাশ্চাত্য ভঙ্গিমায় ওপর ওপর লীলাখেলা ভিন্ন কিছুই করত না সে, যদি না তোমার ঘৃণা তাকে সর্ব্বনাশের পথে ঠেলে দিত।

দিন হ'ল বিরস। রাত্রি হ'ল জাগরণশীল। ইন্দ্রজিৎ চলে গেছে বহুদূরে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। তোমার ঘৃণা, তাচ্ছিল্য সহ্য করতে আর সে ফিরে আসবে না। সহস্র চুম্বনে তৃপ্তি তোমার আনবার জন্য আর সে ব্যাকুল প্রণয়ী প্রতীক্ষা করে থাকবে না। তোমার খেয়াল অনুযায়ী প্রেমের তারতম্য, লঘু-গুরুত্ব কে করে যাবে? কাঁদ রূপালী কাঁদ। চোখের জলে মনের ব্যথা লঘু হ'ক। সে তোমার আকাঙ্ক্ষা বুঝেছিল, বুঝেছিল চেতনার অন্তরালে তুমি কি চাও। তাই মুখের কথা না দিয়ে দেহের, অন্তরের প্রেম দিত। সে ছিল প্রেমিক, যা সহস্রে দুলভ। কিন্তু সে দার্শনিক ছিল না। তাই নারীকে সে বুঝত, তোমাকে বোঝেনি।

ওহো! চল্লিশের রূপালী, আজ তুমি ঠিক বুঝেছ। নির্ব্বিকার নারীত্বে তোমার মুক্তি ছিল। চোখ বন্ধ করে প্রেমকে গ্রহণ করতে হ'ত অনুভূতি দিয়ে, দেহ দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে নয়। তাই আলো-নেভান ঘরে নীরবে প্রেম করতে ইন্দ্রজিৎ ভাল-বাসত। চোখের পাতা তোমার বন্ধ করে দিত, মুখ বন্ধ করে দিত। কেন ধরা দিলে না। তুমি সুখী হ'তে। শুধু কি নন্দার জন্য সন্দেহ? না, না। এত বয়সে মিথ্যা ব'ল না তুমি? তুমি চেয়েছিলে স্বাতন্ত্র্য রাখতে। সহস্র রমণীজিৎ ইন্দ্রজিতকে তোমার ভয় হত যদি তোমার দুর্ব্বলতা সে পরিহাসের চক্ষে দেখে! আজ স্বীকার কর রূপালী, প্রভাতের

সঙ্গে সত্য স্বীকার কর। ভাঙলে তবু মচকালে না। যদি সে তোমাকে সত্যই ভাল না বাসে? সেই ভয়ে তাই তুমি নিজের ভালবাসাকে স্বীকার করনি।

রূপালী চমকিত হ'ল। নিজের ভালবাসা? আমি তো কাউকে ভালবাসিনি। ইন্দ্রজিতকে ভালবাসতে পারিনি বলেই তো রূঢ় কথা বলেছি।

ভুল, রূপালী, ভুল! চল্লিশ বৎসরে আজ উপলব্ধি কর—ইন্দ্রজিৎ ছিল তোমার সেই স্বপ্নের প্রণয়ী, যা'র কথা ভেবে বিমনা হতে তুমি ফাল্গুনের উদাস সমীরে, বর্ষার সিক্ত রাত্রে। মনের মধ্যে গানের মত বাজত দুটি কথা যার স্মরণে—'দেখা হ'বে!' দেখা হয়েছিল, চিনতে পারনি।

ইন্দ্রজিৎ তোমাকে দিতে পারত সুখ, কারণ সে তোমাকে রক্তমাংসে গড়া নারীর দোষত্রুটী দিয়ে দেখত, পূজার আসনে দেবীর পূজা করত না। কিন্তু দৈহিক উচ্ছ্বাসের ভিত্তি ছিল তার প্রেমের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। মুখে সে বলত না, কারণ অভিমান। যে যত ভালবাসে সে তত অভিমান করে। তুমি তাকে যতটা ভালবেসেছিলে, সে যে তার চেয়ে অনেক বেশী তোমাকে ভালবাসত। কিন্তু তার চেয়েও বেশী একজন তোমাকে ভালবেসেছে আজীবন। তার প্রেম এতই বেশী, তার অভিমান এতই প্রবল যে আজও তুমি জানলে না তার কথা!

কাঁদ, রূপালী কাঁদ। আলো নিভিয়ে দাও, বিজলীর আলো। প্রভাত হ'ল প্রায়। ভোরের স্তিমিত দীপ্তি এই যে তোমার মুখে এসে পড়েছে। তোমার জ্বালাময় জীবনে তোমার নির্ম্মম দেবতা অবশেষে স্পর্শ করেছেন! নিজের ভুল বুঝেছ।

তাই, কাঁদ রূপালী, কাঁদ। তোমার জীবনের শেষ প্রেমের জন্য শেষ অশ্রু বিসর্জ্জন কর।

আবার আমি বলি রূপালীর কথা! আমি আরম্ভ করেছি তার বিচিত্র জীবন, শেষ করি আমি।

মাতার বিলাপ। ইন্দ্রজিৎ বিবাহ করেছে। সঞ্জীব পলাতক। পিতার বিরক্তি। রূপেনের উচ্ছৃঙ্খলতা। সমাজের শাসন। দেহের ক্ষুধা। তাই রূপালী বলে বসল—যাকে পাব তাকে বিয়ে করব। ইন্দ্রজিতকে ভুলতে হ'বে, সঞ্জীবকে দেখিয়ে দিতে হ'বে, না? কী ছেলেমানুষ পঞ্চবিংশতির তরুণী।

দুজন পাত্র পাওয়া গেল সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে। বয়স বেশী হ'লে পাত্রীর বাঙালীঘরে ভাল পাত্র যায় না। একজন পুলিশের এস, পি, যা রূপালী ঘৃণা করে। এলাহাবাদে থাকেন। ছবি দেখানও হ'ল ডাকযোগে। পছন্দ করলেন। রূপালী লাহিড়ীকে, যার জন্য সহস্র পুরুষ ব্যাকুল হয়েছে, যার মন অদ্ভুত ধাতুতে গড়া!

অন্যজন ব্যবসায়ী। বয়স অপেক্ষাকৃত কম, শ্যামবর্ণের সুপুরুষ। বাড়ীতে যাতায়াত করলেন, প্রেমের ইঙ্গিত দিলেন। একটু ফিকে নেশা হ'ল আবার রূপালীর। সকলে বলল চাকুরেকে বিয়ে করতে। রূপালী অদেখা বয়স্ক লোককে বিবাহ করতে রাজী হ'ল না। বিবেচনা করে তার পুলিশ সাহেবকেই নেওয়া উচিত ছিল নবীন ব্যবসায়ীকে বাদ দিয়ে। কিন্তু বুদ্ধি হার মানল প্রেমের কাছে। এ আমাকে একান্তভাবে চায়, আমারও ভাল লাগে একে। সুতরাং আবার নেশা জমবে, নয়? আজন্ম প্রেমিকা চতুর ব্যবসায়ীকে বেছে নিল। রূপালী হেরে গেল প্রেমের কাছে।

পুষ্পশয্যায় বিষণ্ণ রূপালী স্বামীকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, তুমি কি ভালবাসতে পারবে আমাকে ?

বর্ম্মা চুরুটের ছাই ঝেড়ে এতদিনের স্বল্পভাষী ব্যক্তি হঠাৎ মুখর হয়ে উঠলেন। সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের নিজমূর্ত্তি প্রকট হ'ল। ক্ষতি কি এখন ? বড় ব্যবসায়ীর একমাত্র ছুহিতাকে বুদ্ধিচাতুর্য্যে তো বিবাহ করাই হয়েছে। স্বামী বললেন, খুব নভেলীভাবে কথা বল তুমি, না ? ও কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ?

একটু চিন্তিত স্বরে—ওঃ, বুঝেছি। অনেকে কিন্তু তোমার সম্বন্ধে নানা কথা বলেছিল আমাকে। প্রেম করাই নাকি তোমার অভ্যাস। অনুরাগের স্বরে সান্ত্বনা—ওতে কিছু হবে না। ছুই একটি ছেলেপিলে হ'লেই আপনি মন ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর ? যা হয়। সুদীর্ঘ চুম্বন। দান্তের চুম্বনে বিয়াত্রিচে প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন, চিত্রে আঁকা যায়। কিন্তু সেইক্ষণে, সেদিনের সেই চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে আমার রূপালীর মৃত্যু হ'ল।

আরও আছে। সৎকার এখনও হয়নি। পাশের ঘরে স্বামী নিদ্রিত। নবীন ব্যবসায়ী, ব্যবসা জমেনি। যে আড়ম্বর দেখে রূপালীর পিতা কন্যাদান করেছিলেন, সে ছিল নকল। ঋণের ওপর সমস্ত ব্যবসায় চলছিল। বুদ্ধি করে তাই ব্যবসায়ীর মেয়ে বিবাহ করেছিলেন স্বামী! পঞ্চসন্তানের জননী রূপালী, তুচ্ছ প্রেমের স্বপ্ন দেখে রাত্রি কাটালে ? ঘুমিয়ে নিলে ভাল কাজ করতে, বুদ্ধির কাজ করতে। স্বপ্ন দেখে কি লাভ হ'ল ? সকালে রন্ধনশালায় রাঁধতে যে তোমাকেই হয়।

পার্কসার্কাসে ত্রিতল বাটী, রাজকীয় গৃহসজ্জা, দেউরীতে ঘুমন্ত দ্বারবান। এ সব যার থাকে, তার আর যা করতে হ'ক

অন্ততঃ রান্নাঘরে রান্না করতে হয় না। কিন্তু এসব কিছুই রূপালীর নয়।

বিবাহের কিছুদিন পরে রূপালী দেখল সে ভুল করেছে। আলেয়ার মত প্রেম আবার তাকে পথ ভুলিয়েছে। ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে অফিস, ল্যান্সডাউনে সুসজ্জিত ত্রিতল বাড়ী, ডজ-গাড়ী, সপ্রতিভ চট্পটে চেহারা—যা দেখে রূপালীর বাবা বিবাহ দিতে রাজী হয়েছিলেন অনিচ্ছায়ও, সে সব ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেল। সপ্রতিভ, কায়দাদুরস্ত যুবক অবশেষে সামান্য চাকুরী গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। সব কিছু গেল…রইল দারিদ্র্য, রইল অবাঞ্ছিত সন্তান! ক্ষুধাতুরদের অন্ন যোগাতে যোগাতে ভুলে গেল রূপালী স্বামী তাকে ভালবাসেন কি না, অথবা কি টেক্নিক্ এখন প্রয়োগ করতে হবে!

পিতা অর্থশালী, সুতরাং সাহায্যপ্রাপ্তির আশা করা সঙ্গত ছিল। কিন্তু, কপালক্রমে পিতাও রইলেন না। বিবাহের পরই তাঁর মৃত্যু হ'ল তখনও ডজারূঢ়া কন্যাকে দেখে। উইলে কিছু দেবার আবশ্যকতা বোঝেন নি, দেবার মত বেশী কিছুও রেখে যেতে পারেন নি। অনভিজ্ঞ, শিথিল চরিত্র রূপেন ব্যবসা চালাতে পারল না। আর একটি ব্যবসায় নষ্ট হ'ল। রত্নাকে বিবাহ করে কোনক্রমে একটি ফ্ল্যাটে সে দিন চালাচ্ছে। ছোট-ভাই শ্বশুরের খরচে বিদেশে গেছে। শোকাতুরা মাতা বহুদিন গত হয়েছেন। সুতরাং, সাহায্যের কেউ নেই।

বিবাহের সময় আদর্শবাদের প্রেরণায় রূপালী নগদ টাকা দিতে দেয় নি বাবাকে। তার মনে প্রতিজ্ঞা ছিল যে তাকে নেবে সে তার জন্যই তাকে গ্রহণ করবে, অন্য কিছুর প্রাপ্তি আশায় নয়। প্রেমের সম্বন্ধের ওপর রৌপ্য ছায়াপাত করতে পারবে না। আবার প্রেম?

সুতরাং রূপালী সব দিক দিয়েই ঠকে গেল। তার বাবা তাকে সে সময়ে বেশ কিছু দিতে পারতেন।

এ বাড়ী, এ ঐশ্বর্য্য রূপালীর কাকার। রূপেন মদ ধরবার পরই কাকা বিবাহ করে পৃথক হয়েছিলেন। কাকা এখন প্রকাণ্ড এঞ্জেনীয়র। খুড়তুতো বোন মাধবীর বিবাহে রূপালী ও রূপালীর পরিবারবর্গ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। কাল সকালে তারা নিজেদের বাড়ী ফিরবে। তবু, একবার এই আবেষ্টনীতে, তার কুমারীজীবনের সুলভ প্রাচুর্য্যপূর্ণ আবেষ্টনীতে, শেষবারের মত সে দেখে গেল তার জীবনের সুখস্মৃতির ইতিহাস। শেষবারের মত আজ সে বিচার করে গেল নিরাসক্ত চিত্তে তার চরম ভুলত্রুটীর কাহিনী! এ মানস-বিলাস শেষ হ'ক আজই। তার বর্ত্তমানের হীন-স্খলিত জীবনে এত বর্ণপ্রাচুর্য্য শোভা পায় না। আজ রজনীঅন্তে এই খাতা সে বিসর্জ্জন দেবে।

কাল সে ফিরে যাবে নিজের বাড়ীতে। ছোট, একতলা বাসাবাড়ী। সেখানে অপেক্ষা করে আছে অভাব, অপূর্ণতা। এক এক সময়ে ভাতের ফেন পায়ে পড়ে গেলে রূপালী ভাবে জানি, টেনিস্ খেলে আর গান শিখে সময় সে নষ্ট করেছে। রান্না শিখলে ঘরের কাজ করতে তার এত কষ্ট হ'ত না।

জীবন তোমাকে বঞ্চনা করেছে রূপালী, তাতে ক্ষতি কি? জীবনের মূল্য কি সুখদুঃখের পরিধি বিচার করে? তোমার জীবনে তুমি বহুকে আনন্দ দিয়েছ, মানুষের মনের শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তিকে জাগিয়েছ। তার কি মূল্য নেই?

আমার মনের সুপ্তভাবকে ভাষা দিয়েছিলে তুমি। তোমাকে ভালবেসে ভালবাসার অর্থ শিখেছিলাম। আমার সে বঞ্চিত

প্রেম আজও তোমার পথ চেয়ে আছে, রূপালী। কিন্তু, তুমি তার দিকে ফিরেও দেখনি।

দূরের মোহ তোমাকে পাগল করেছিল। তোমার পাশে ছিলাম চিরদিন, তাই আমার কথা তোমার মনে স্বপ্নেও উদয় হয়নি। আমি তোমার একদা-ভূস্বামী পিতামহের মুহুরীপুত্র। আজন্ম তোমাদের বাড়ী প্রতিপালিত হয়েছিলাম তোমার ছায়ার মত। এম-এ পাস করে বৃত্তি লাভ করলাম বিদেশ যাবার। নামের আগে পিছে অক্ষর জুড়ে ফিরে এলাম, অধ্যাপক হ'লাম। তবু তোমার উপযুক্ত হ'তে পারলাম না। কারণ আমি যে দীনহীন মুহুরী নিতাই বাগচীর ছেলে। রাজা-জমীদার তোমার পূর্ব্বপুরুষ, তাদের রক্ত তোমার শরীরে। তোমাদের অন্নপুষ্ট আমার যে দুরাশা হ'লেও হ'তে পারে, সে কথা ভাববার অবকাশ কখনও তোমার হয়নি। রাজ্ঞী কখনও ভৃত্যের প্রেমনিবেদন গ্রহণ করে না। তোমার আমার সম্বন্ধ ছিল—ওই।

যে প্রেমের সন্ধানে ফিরেছিলে ব্যাকুল হয়ে, সেই প্রেম আমি তোমাকে দিতে পারতাম যত চাও তুমি। তোমার ক্লান্তি আসত, আমি সজাগ অপেক্ষা করতাম। যত চাও তুমি তত। তবু অভিমান আমার কণ্ঠরোধ করেছিল। তোমার দৃষ্টিতে ছিল দূরের মোহ, কাছের প্রেমিককে তুমি চিনতে পারনি। আজ তুমি অশ্রুত্যাগ করছ, কোনও প্রেম স্থায়ী হ'ল না। আজও জাননা তুমি আমার নীরব ভালবাসা, যা এখনও একান্তভাবে তোমাতেই বিলীন।

আজও আমি বিনিদ্র রজনী আমার জানালার সম্মুখে বসে চেয়ে আছি তোমার বাতায়নে। ক্ষীণ আলো সাক্ষ্য দিচ্ছে তোমার জাগরণের কাহিনী। মাধবীর বিবাহে আমারও নিমন্ত্রণ হয়েছে। কিন্তু আমার জাগরণের সাক্ষী একটি প্রদীপশিখাও আমি জ্বালিয়ে রাখিনি।

শোন রূপালী, শোন। অশ্রু ফেল না আর—তোমার একবিন্দু অশ্রু যে আমার সহস্র মৃত্যুর সমান। আমি ছিলাম তোমার একমাত্র প্রেমিক, যে শুধু নীরবে তোমাকে দিয়ে গিয়েছে, প্রতিদান চায়নি। মুখ তুলে তাকাও রূপালী। দিগন্তে প্রভাতের পদচিহ্ন। তুমি পরকাল বিশ্বাস ক'র না, আমি করি। আমার পরকাল তুমি।

কাঁদ রূপালী, কাঁদ—যে প্রেম পেয়েছ তার জন্য কাঁদ, যা পেয়েও চিনে নাওনি আজ তারও জন্য কাঁদ।

রূপালী উঠে দাঁড়াল। প্রভাতের আলো ঘরে লুটিয়ে পড়েছে। স্বপ্নময় প্রেমরজনী গত, আজ প্রখর বাস্তব। আজ শেষ। ক্ষীণ রেশের আজ অবসান। আজ শেষ। আজ সব শেষ।
